অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

গজাননের কৌটো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. মঙ্গলেশ্বরী অস্ত্রোপচার কেন্দ্র 2
২. ইতিহাসবিত ধর্মনগর 12
৩. অঘোরকৃষ্ণবাবুর সময়টা 20
৪. উকিল বিষাণ দত্তের পসার 37
৫. প্রথমে দেখেছিল অবু 49
৬. মধ্যরাত্রে ছয়টি হনুমান 62
৭. পুলিশ এসেছে 73

১. মঙ্গলেশ্বরী অস্ত্রোপচার কেন্দ্র

দোকানের বাইরে মস্ত সাইনবোর্ড 'মঙ্গলেশ্বরী অস্ত্রোপচার কেন্দ্র', নীচে লেখা–"এখানে অতি সুলভে কাটা হাত, পা, মুণ্ডু ইত্যাদি যত্ন সহকারে নিখুঁতভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"

দোকানের ভেতরে রমরম করছে ভিড়। লম্বা একটা হলঘরে বেঞ্চে বসে আছেন হাতকাটা নকুড়বাবু। হলঘরের অন্য প্রান্তে একটা লম্বা অপারেশন টেবিলের ওপরে বুকে কাটা হাত, পা, মুণ্ডু জুড়ে যাচ্ছে একটা দাড়িগোঁফওলা লোক। ভীষণই ব্যস্ত। তাকে ঘিরে মেলা লোক "আমারটা আগে করে দিন দাদা, আমাকে আগে ছেড়ে দিন দাদা" বলে কাকুতি মিনতি করছে। লোকটা খুব একটা ভূক্ষেপ করছে না। শুধু বলে যাচ্ছে, "হবে রে ভাই হবে, একটু সবুর করো। এক-এক করে সবাইকেই মেরামত করে দেব।"

নকুড়বাবুর পাশে একটা লোক নিজের কাটা মুণ্ডুটা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে বসে আছে। মুণ্ডুটা পিটপিট করে চারদিকে চাইছিল। নকুড়বাবুকে বলল, "বুঝলেন মশাই, গজু কারিগরের হাতটি বড় ভাল। কিন্তু খদ্দেরের ভিড়ে লোকটা হিমসিম খাচ্ছে।"

নকুড়বাবু বললেন, "তাই দেখছি। তা আপনার মুণ্ডু কাটা গেল কীভাবে?"

"সে আর বলবেন না। রাতের খাওয়া শেষ করে সবে পায়েসের বাটিতে হাত দিয়েছি, এমন সময় বাড়িতে ডাকাত পড়ল। আমি তবে রে' বলে যেই লাফিয়ে উঠেছি অমনি ফ্যাচাং।"

"আচ্ছা।"

"মুণ্ডু কাটা পড়লে বড় অসুবিধে মশাই। খাওয়া দাওয়াই বন্ধ।"

"তা বটে।"

"দেখি, যদি আজকেই গজু জুড়ে দেয়, তবে বিকেলে ভাল খ্যাঁট চালিয়ে দেব।"

ওদিকে একটা লোক খুব চেঁচামেচি লাগিয়েছে, "এটা তোমার কেমন আক্কেল বলল তো গজুদা! ভুল করে আমার মুণ্ডু বাঞ্ছারামের ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে! ছিঃ ছিঃ। আমি হলুম ফরসা আর বাঞ্ছারাম হাকুচ কালো। তার ওপর বাঞ্ছারামের কোমরে দাদ আছে। বলি কি, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?"

গজু ওস্তাদ মোলায়েম গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ওরে, অমন চেঁচাসনি, এক হাতে এত কাজ করলে একটু আধটু ভুলচুক কি আর হতে নেই! আজ বাড়ি যা, সামনের সপ্তাহে আসিস, ধড় বদলে দেবখন।"

"না না, সে হবে না, আমার ধড়টাই আমার চাই।"

"আহা, তোর ধড় এখন খুঁজে দেখবে কে? কোন মুণ্ডু তোর ধড়ে চেপে চলে গেছে কে জানে? সে যদি ফেরত দিতে আসে তখন দেখা যাবে। একা হাতে কাজ, সামলানো মুশকিল।"

"তোমাকে কবে থেকে বলছি টিকিট সিস্টেম করো, টিকিট সিস্টেম করো, তা কথাটা কানেই তুলছ না। ধড়ে আর মুণ্ডুতে নাম ঠিকানা লেখা টিকিট সেঁটে রাখলে তো আর ভুল হয় না।"

"হবে রে বাপু, হবে। একটু সবুর কর, সব হবে।"

হঠাৎ আর একটা লোক পিছু হেঁটে দোকানে ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, "এটা কী করলে গজুদা?"

গজু খুব স্নেহের গলায় বলল, "কেন, তোর আবার কী হল?"

লোকটা খাপ্পা হয়ে বলল, "দেখছ না, কী কাণ্ড করেছ?"

নকুড়বাবু দেখলেন লোকটার মুণ্ডু পেছনদিকে ঘোরানো। চোখ, নাক, মুখ, সব পেছনদিকে।

লোকটা বলল, "অজ্ঞান করে মুণ্ড জুড়েছ। তারপর ঢাকাঁচাপা দিয়ে আমার ছেলেরা আমাকে বাড়ি নিয়ে গেছে। জ্ঞান হয়ে দেখছি এই কাণ্ড। চোখ পেছনে বলে সামনের দিকে হাঁটতে পারছি না। খেতে গেলে কাঁধের ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মুখে গরাস দিতে হচ্ছে, তাও ঠিকমতো মুখে যাচ্ছে না। লোকের সঙ্গে পিছু ফিরে কথা কইতে হচ্ছে। ভীমরতি হল নাকি তোমার?"

নকুড়বাবুর বাঁ পাশে বসা একজন বুড়োমানুষ বলে উঠলেন, "ভীমরতি ছাড়া আর কী? এই তো আমার দুটো কাটা হাত জুড়তে গিয়ে বাঁ হাত ডান হাতের জায়গায় আর ডানটা বাঁয়ের জায়গায় জুড়েছে। কী যে কাণ্ড করে গজু মাঝে মাঝে! তবে হ্যাঁ, দু-চারটে গণ্ডগোল করলেও ওর মতো কারিগর নেই। এমন জুড়বে যে, কখনও কাটা গিয়েছিল বলে মনেই হবে না। তা মশাই, আপনার কেসটা কী?"

নকুড়বাবু করুণ গলায় বললেন, "ছেলেবেলায় সেপটিক হয়ে হাতে পচন ধরায় ডাক্তাররা নুই অবধি কেটে বাদ দিয়েছিল। তা সেই হাতের জন্যই আসা।"

"অ। তা একটা হাত কি জোগাড় করে এনেছেন?"

"না তো?"

"তা হলেই তো মুশকিল। হাত একখানা জোগাড় করে আসলে ভাল হত। গজুর কাছে অবিশ্যি হাত পাওয়া যায়। দামটা একটু বেশি পড়বে আর সব বেওয়ারিশ হাত। লাগালে অসুবিধে হতে পারে। হয়তো চোর-ছ্যাঁচড় বা খুনে-গুণ্ডার হাত, কিংবা পকেটমারেরও হতে পারে। তখন দেখবেন হাত সামলানো মুশকিল হবে। আপনি হয়তো চান না তবু

আপনার হাত হয়তো কারও জিনিস চুরি করল বা কাউকে হঠাৎ খুন করেই বসল কিংবা কারও পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিল।”

“ও বাবা! তা হলে কী হবে?”

এই স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন নকুড়বাবু। তারপর তাঁর আর ঘুম হয়নি। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড! সকালবেলাতেই একটা দাড়িগোঁফওয়ালা লোক এসে হাজির হল।

“মশাই, সদাশিব রায়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?”

নকুড়বাবু জবাব দেবেন কি, হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। এ যে স্বপ্নে দেখা গজু কারিগর! সেই মুখ, সেই দাড়িগোঁফ! এ কি ভগবানেরই লীলা! গজু কারিগর সশরীরে তাঁর বাড়িতে! তা হলে কি তাঁর ডান হাতের দুঃখ এবার ঘুচবে?

খুব খাতির করে লোকটাকে বসালেন নকুড়বাবু। বললেন, “সদাশিব রায় বলে তো এখানে কেউ নেই। তা মশাই, সদাশিবের বাড়ি না থাক, আমার বাড়ি তো আছে, এখানেই থাকুন না হয়।”

লোকটা কেমন যেন বুঝুঁস হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, “তস্য পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদিও কি কেউ নেই?”

“আজ্ঞে, তা তো জানি না, দরকারটা কীসের?”

“খুবই দরকার।”

নকুড়বাবু বললেন, “রায়বাড়ি অবশ্য এখানে একটা আছে। হরিকৃষ্ণ রায়। রথতলা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই বাঁ-হাতি বিরাট বাড়ি। তারা সদাশিব রায়ের কেউ হয় কি না তা অবশ্য জানি না। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে?”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "বিশেষ কোনও জায়গা থেকে নয়। আমি ঘুরে-ঘুরেই বেড়াই।"

"তা আপনার নামটি?"

"গজানন, জাদুকর গজানন।"

নকুড়বাবু লাফিয়ে উঠলেন, "গজানন! অ্যাঁ! আরে আপনিই তো তবে গজু কারিগর! কী সৌভাগ্য আমার! কী সৌভাগ্য! এ যে ভাঙা ঘরে চাঁদের উদয়! এ যে কাঙালের ঘরে লক্ষ্মীর আগমন! এ যে লঙ্কায় জয় বাবা হনুমান! না না, এই শেষ কথাটা দয়া করে ধরবেন যেন?"

লোকটার অবশ্য কোনও কথাতেই তেমন গা নেই। চুপচাপ বসে রইল।

নকুড়বাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই পথের ধকল গেছে খুব। আর খিদেটাও নিশ্চয়ই চাগাড় দিয়েছে। দাঁড়ান, ব্যবস্থা করে আসছি।"

কিন্তু লোকটার যেন কোনও ব্যাপারেই তেমন গা নেই। খুব অন্যমনস্ক। ভারী চিন্তান্বিত। কাছেপিঠের কিছুই যেন লক্ষ করছে না। সকালে মুড়ি-শশা-চানাচুর দেওয়া হল, সঙ্গে চা। লোকটা সেসব একটু নাড়াচাড়া করল মাত্র। দুপুরে সামান্য দু-চার গরাস ভাত মুখে দিয়ে উঠে পড়ল।

নকুড়বাবুর স্ত্রী বাসবী দেবী বললেন, "এ কোন কিম্ভূতকে

জোটালে গো! হাঁটাচলা দেখেছ? ঠিক যেন অষ্টাবক্র মুনি।"

নকুড়বাবুর দশ বছরের ছেলে বিলু বলল, "একটু আগে কী দেখলুম জানো? পুকুরে চান করতে নেমে লোকটা মোটে ডুবই দিল না। পুরো শরীরটা ভেসে রইল। যেন শোলার মানুষ। উঠোন থেকে যখন বারান্দায় উঠল তখন দেখলুম বাতাসে ভেসে উঠল।"

নকুড়বাবুও এসব দেখেও দেখেননি। বললেন, "ওঁরা সব গুণী মানুষ।"

বাসবী দেবী চোখ বড় বড় করে বললেন, "ভূতপ্রেত নয় তো গো?"

ধন্দ একটু নকুড়বাবুরও আছে। তবু মাথা নেড়ে বললেন, "ভূত নয়, তবে ভগবানের কাছাকাছি কেউ হবে। কারণ, কাল রাতেই আমি লোকটাকে স্বপ্ন দেখেছি। আমার কাটা ডান হাতটা ফের জোড়া লাগাতেই ওঁর আসা। খুব বড় কারিগর। বেশ যত্নআত্তি করো দেখি।"

"ওমা! যত্নআত্তি করব কী? উনি তো এইটুকু ভাত খান। ভাল করে বিছানা পেতে দিয়েছি, উনি তো মোটে শুলেনই না। আর যে গিয়ে দুটো খোসামুদি কথা বলব তারই বা উপায় কী? উনি তো সর্বদা যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছেন।"

কথাটা ঠিকই যে, জাদুকর গজাননের কোথায় যেন গণ্ডগোল আছে। হাঁটছে না ভেসে বেড়াচ্ছে তা বোঝা যায় না। রাত্রিবেলা নকুড় বাইরের ঘরের চৌকিটাতে বিছানা করে গজাননের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজে শুলেন পাশেই মেঝেতে মাদুর পেতে। এঁরা সব ভগবানের লোক। এঁদের হাওয়া বাতাসেও মানুষের পুণ্যি হয়। কিন্তু মাঝরাতে হ্যারিকেনের সলতে কমানো আবছা আলোয় যা দেখলেন তা অবিশ্বাস্য। দেখলেন, গজাননেন শরীরটা বারবার যেন শূন্যে ভেসে উঠে পড়তে চাইছে, আর গজানন শূন্যে সাঁতার কাটার মতো করে বারবার নেমে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষ তো গ্যাস-বেলুন নয়! তবে শূন্যে ভাসছে কী করে?

ভয়ে-দুশ্চিন্তায় রাতে নকুড়বাবুর ভাল ঘুমই হল না। তাঁর স্ত্রী ভূতের কথা বলছিলেন। কে জানে বাবা, ঘরে একটা ভূতই ঢুকে পড়ল নাকি?

সকালবেলায় মুখোমুখি চা খেতে বসে নকুড়বাবু বলেই ফেললেন, "আচ্ছা, আপনি আসলে কে বলুন তো? রাত্রিবেলা দেখলুম, আপনি বিছানা থেকে বারবার ভেসে উঠছেন গ্যাস বেলুনের মতো। ভূতটুত নন তো?"

গজানন জুলজুল করে চেয়ে থেকে বলল, "কে জানে বাবা, আমি আসলে কে। তবে ওজনটা বড় কমে গেছে। ওইটেই হয়েছে মুশকিল। যখন-তখন কেন যে ভেসে উঠছি কে জানে!"

"আপনি তো জাদুকর। বলি কুম্ভক-টুম্ভক জানেন নাকি? প্রাণায়ামে নাকি ওসব হয়।"

"জানতুম তো মেলাই। এখন কিছু মনে পড়ে না।"

"আমি বড় আশা করে আছি, আপনার দয়ায় যদি আমার ভাল হাতটা হয়ে যায়।"

গজানন তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "ডান হাত ছাড়া কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

"আজ্ঞে, খুব অসুবিধে। ধরুন গামছা নিংড়ানো যায় না, তবলা বাজানো যায় না, হাততালি দেওয়া যায় না।"

"যদি এতকাল চলে গিয়ে থাকে তা হলে বাকিটাও চলে যাবে। কাজ কী ঝামেলা বাড়িয়ে?"

"ঝামেলা কেন বলছেন? হাতটা কি কাজে লাগবে না?"

গজানন মৃদু গলায় বলে, "আমাদের ফটিক ছিল জন্মান্ধ। বেশ চলে যাচ্ছিল তার। হঠাৎ কে একজন কবরেজ এসে তার চোখ ভাল করে দিল। এখন ফটিকের কী মুশকিল! চোখে আলো সহ্য হয় না, রং সহ্য হয় না, যা-ই দেখে তাই তার কাছে কিম্ভুত, অসহ্য মনে হয়। শেষে কান্নাকাটি, চেঁচামেচি। তাই বলছিলুম হাত বাড়ালে হয়তো ঝামেলা বাড়বে।"

এমন সময় প্রতিবেশী গুনেন সরকার এসে হাজির। "শুনলুম তোমার বাড়িতে একজন মস্ত গুনিন এয়েছেন। তাই দেখা করতে এলুম। কতকাল ধরে একজন ভাল গুনিন খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার বেগুনখেতে প্রতি বছর পোকা লাগছে, রাঙা গাইটা দুধ দিচ্ছে না মোটে,

মাজার ব্যথাটা সেই যে কচ্ছপের কামড়ের মতো লেগে আছে, আর ছাড়ছেই না। তার ওপর ছেলের বউয়ের সঙ্গে তার শাশুড়ির নিত্যি ঝগড়া লাগছে, বাড়িতে তিষ্টনো যাচ্ছে না। কদম বিশ্বেসের সঙ্গে মামলাটা এখনও ঝুলে রয়েছে...”

গজানন কথাগুলো শুনতে-শুনতে হঠাৎ একটা ঢেকুর তুলতেই তার শরীরটা পক করে খানিকটা শূন্যে উঠে পড়ল, তারপর একটু হেলেদুলে পেঁজা তুলোর মতো নেমে এল নীচে।

গুনেন সরকার কথা থামিয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখল। তারপর সোজা সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, “চর্মচক্ষে আজ এ কী দেখলাম বাবা! ইনি যে মস্ত গুনিন! সাক্ষাৎ শিবের অবতার...”

গজানন একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বিড়বিড় করে বলল, “বড্ড হালকা হয়ে গেছি। নাঃ, ডিবেটা না হলেই নয়।”

খবর পেয়ে আরও পাড়াপ্রতিবেশী জড়ো হয়ে গেল। রীতিমত ভিড়। সবাই নিজের নিজের নানা সমস্যার কথা বলতে লাগল। কে কার আগে বলবে তাই নিয়ে ঝগড়াও লেগে যেতে যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে উঠে নকুড়বাবু দেখলেন, সদর দরজা হাট করে খোলা। গজানন নেই। নেই তো নেই-ই। নকুড়বাবু খুবই দুঃখ করতে লাগলেন, “এ হেঃ! আমার ভাল হাতটা ওঁর দয়ায় হয়ে যেত। সবাই মিলে এমন বিরক্ত করল যে, লোকটা গায়েব হয়ে গেল!”

বৃন্দাবনের দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। গত সাতদিন তার কোনও রোজগার নেই। সাধুচরণ সাহার বাড়ির জানলার গরাদ ভেঙে চুরি করতে ঢুকেছিল মাঝরাতে। ভুলচুকও কিছু করেনি। আগে মন্তর পড়ে বাড়ির লোকজনের ঘুম গাঢ় করে নিয়েছে। কুকুরের মুখবন্ধন করার মন্তরও পড়ে নিয়েছে। ঠাকুর-দেবতাদের পেন্নাম করতেও ভুল হয়নি। সবই ঠিকঠাক ছিল। গরাদ সরিয়ে ঢুকে পড়েছিল অর্ধেকটা। এমন সময় তার পায়ে লেগে

টুলের ওপর রাখা একটা জলভর্তি মেটে কলসি মেঝেতে পড়ে বিকট শব্দে ভেঙে যাওয়ায় বিপত্তিটা ঘটল। সাধুচরণ তড়াক করে উঠে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিল কবজিতে। তারপর 'চোর, চোর' বলে চেঁচানি। বৃন্দাবন হাতের চোট নিয়েও যে পালাতে পেরেছে সে ভগবানের আশীর্বাদে। আর অনেকদিনের অভিজ্ঞতা আছে বলে।

কবজি ফুলে ঢোল হয়ে থাকায় দিনসাতেক আর কাজকর্ম করতে পারেনি। আজই মাঝরাতে বেরিয়েছে, হারু মণ্ডল ধান বেচে আজই কিছু টাকা পেয়েছে, সেইটে হাতাতে পারলে কয়েকদিন ভালই চলে যাবে।

হারু মণ্ডলের বাড়িতে ঢোকা বেশ সহজ কাজ। মাটির ভিটে বলে সিঁধ দিতে অসুবিধে নেই। আর হারুর ঘুমও খুব পাকা। বৃন্দাবন মন্তর-টন্তর পড়ে নিয়ে ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করে সবে দক্ষিণের ঘরে সিঁধ দেওয়ার জন্য ছোট যন্তরটা চালিয়েছে, হঠাৎ কে যেন খুব ক্ষীণ গলায় বলে উঠল, "ডিবেটা যে কোথায় গেল!"

বৃন্দাবন চমকে উঠে পেছন ফিরে যা দেখল, তাতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার কথা। একটা লোক যেন বাতাসে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মাটির একটু ওপরে পা। একটু ক্ষয়াটে জ্যোছনায় দেখা যাচ্ছে, লোকটা বেশ রোগাভোগা আর দাড়িগোঁফ আছে।

"ভূত!" বৃন্দাবনের হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

লোকটা তার দিকে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, "সদাশিব যে কোথায় গেল, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। জায়গাটা পালটে গেছে কত!"

বৃন্দাবন কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে, আপনি কে? দেবতা না অপদেবতা?"

লোকটা মাটির ওপর নেমে দাঁড়িয়ে তাকে একটু দেখল। তারপর বলল, "আমি জাদুকর গজানন। সদাশিবের বাড়ি কোথায় জানোনা?"

"আ-আজ্ঞে না।"

"তুমি তো চোর। সব বাড়িই তোমার চেনার কথা। আমি যে সদাশিবকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"ও নামে যে কেউ এখানে নেই!"

"ইস! তা হলে যে ভীষণ বিপদ!"

২. ইতিহাসবিত ধর্মনগর

“মহাশয়। ইহাই সেই ইতিহাসবিত ধর্মনগর। এখন দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে, এই জনবিরল, বসতিবিরল, শ্বপদসঙ্কুল, আগাছায় পরিপূর্ণ স্থানটিতে সুরম্য হ্যরাজি ছিল, বিশাল দীর্ঘিকাসমূহ, রাজপথ কাননাদিতে সুসজ্জিত এই নগরীর পশ্চিম প্রান্তে পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদে রাজা মঙ্গল রায় বাস করিতেন। আজ সবই স্বপ্ন মনে হয়। অনুমান, দুইশতবার্ষিক বৎসর পূর্বের সেই নগর কালের নিয়মেই বিলীন হইয়াছে। আপনার ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ সদাশিব এই নগরীতেই বাস করিতেন।”

গন্ধর্ব হতাশ মুখে সামনের দিকে চেয়ে জায়গাটা দেখছিল। বনবাদাড়, ঢিবি, গর্ত ইত্যাদিতে ভরা এক বিটকেল জায়গা। এখানে ধর্মনগর ছিল বলে বিশ্বাস করা কঠিন। সে একটা হাই তুলল।

শাসন ভট্টাচার্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “মহাশয় কি জৃম্ভন করিলেন?”

গন্ধর্ব জৃম্ভন মানে জানে না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “আজ্ঞে না।”

“ভাল। মহাশয়ের বোধ করি আমার বিবরণ বিশ্বাস হইতেছে না।”

লজ্জা পেয়ে গন্ধর্ব বলে, “আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করার অভ্যাস নেই। ধর্মনগরের ধ্বংসাবশেষের কিছু চিহ্ন থাকলে ভাল হত। আর আমি ঠিক আমার পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটির সন্ধানেও আসিনি।”

“তাহা আমি জানি। লোকের মুখে শুনিয়াই আপনি একটি কিংবদন্তির পিছনে ঘুরিতেছেন।”

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলে, “ঠিক তাও নয়। আমি একটা মিথকে ভাঙতে চাইছি।”

শাসন ভট্টাচার্য উদাস মুখে বলল, “ভাঙিয়া কী লাভ? পুরাকালে যেমন, বর্তমানেও সেইরূপ মানুষ নানা আজগুবিতে বিশ্বাস করে। আপনি একটি মিথকে ভাঙিবেন তো আর একটির সৃষ্টি হইবে। আরও একটি ব্যাপার হইল, মিথকে ভাঙা অতীব কঠিন। আপনি বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়া যদিবা ভাঙিলেন, মানুষ আপনাকে পরিহার করিয়া মিথটাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে। আপনি বৃথা শ্রম করিতেছেন মহাশয়।”

গন্ধর্ব হতাশভাবে বলে, “হয়তো তাই শাসনবাবু, দেশজোড়া অন্ধ কুসংস্কার, বিদঘুঁটে কিংবদন্তি আর প্রচলিত ভুল ধারণার সঙ্গে লড়াই করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমাকে তবু লড়াইটা করতে হচ্ছে নিজের স্বার্থে।”

“মহাশয়, ভাঙিয়া বলুন।”

“আমার পরিবারে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, জাদুকর গজানন এখনও বেঁচে আছেন। তিনি মাঝে-মাঝে এসে হাজির হন এবং নানা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করে হঠাৎ উধাও হয়ে যান।”

শাসন হেসে বলল, “মহাশয়, আপনি বিজ্ঞানী, মানুষের ভুল ধারণা ঘুচাইয়া দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য করিবেন। কিন্তু জোর করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই সকল কার্যের জন্য ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন।”

“সেটা আমার আছে বলেই আমি গজাননের মিথ ভাঙতে চাইছি। গজাননের গল্পটা কি আপনি জানেন?”

“জানি মহাশয়, অনেকেই জানে। আপনার ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ সদাশিব সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান।”

“কিন্তু সদাশিবের পুঁথি তো পাওয়া যায়নি!”

"না মহাশয়, পুঁথিটি আমিও কম অনুসন্ধান করি নাই। কিন্তু পুঁথি বিলুপ্ত হইলেও সদাশিবের বিবরণ মানুষের মুখে-মুখে ফিরিয়া থাকে। সুতরাং পুঁথির কাহিনী বাঁচিয়া আছে। রাজা মঙ্গল রায় যে খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার রাজ্য সুশাসিতই ছিল। তবে রাজা মঙ্গল ছিলেন মহা বলশালী মল্লবীর। তাঁহার সমতুল্য মল্লবীর কেহ ছিল না। কিন্তু রাজার মস্ত দোষ ছিল, মল্লযুদ্ধে পরাজিত প্রতিপক্ষকে তিনি মল্লভূমিতেই বধ করিতেন। বধ না করিলে তাঁহার শান্তি হইত না। এই নরহত্যার পৈশাচিক আনন্দ তাঁহাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিত যে, তিনি কয়েকদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের মতো আচরণ করিতেন।"

"হ্যাঁ, রাজা মঙ্গল একটি সাইকোটিক কেস। সম্ভবত ম্যানিয়াক।"

"হাঁ মহাশয়, মনোবিকলন গ্রন্থাদিতে এইরকম প্রবণতাযুক্ত মানুষের বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথম-প্রথম মোটা পুরস্কারের লোভে দেশ-দেশান্তর হইতে মল্লবীরেরা রাজা মঙ্গলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে আসিত। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে তাহাদের সংখ্যা কমিতে লাগিল। প্রথমত, রাজা মঙ্গল অতি দুর্ধর্ষ মল্লযোদ্ধা, তাহাকে পরাজিত করিয়া পুরস্কার লাভ করা অতীব কঠিন। দ্বিতীয়ত, পরাজিত হইলেই বধ হইবার ভয়। ফলে যত দিন যাইতে লাগিল তো মল্লযোদ্ধাদের আগমন হ্রাস পাইতে পাইতে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা মঙ্গল তাহাতে ক্ষান্ত হইবেন কেন? মল্লযুদ্ধে প্রবল আকর্ষণ ও বধাভিলাষ তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিল। তিনি অতঃপর যাহাকে তাহাকে মাঠঘাট হইতে ধরিয়া আনিতে সান্ত্রীদের পাঠাইতেন। সান্ত্রীগণ নিরীহ পথচারী বা কৃষক-শ্রমিক যাহাকে হউক ধরিয়া আনিত। তাহারা মল্লযুদ্ধের ম-ও জানিত না। কিন্তু রাজা মঙ্গল তাহাদের মল্লভূমিতে ধরিয়া পৈশাচিক আনন্দে বধ করিতে লাগিলেন।"

"বিস্মিত হয়ে গন্ধর্ব বলল, "রোজ?"

একটু হেসে মাথা নেড়ে শাসন বলে, "না মহাশয়, প্রত্যহ নহে। পক্ষকালে একবার। পঞ্চদশ দিবস অন্তর অন্তত একটি নরহত্যা না করিতে পারিলে রাজা মঙ্গল অতিশয়

অশান্ত ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অমাত্য ও রাজকর্মচারীগণ এই পৈশাচিক কর্মের সহায়তা করিত। নহিলে তাহাদের নিজেদের গাত্রচর্ম অক্ষত থাকে না।”

গন্ধর্ব বলল, “বুঝেছি। বলুন।”

“এইরূপে প্রজাদের মধ্যে ক্রমশ অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। অনেকে বিশেষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রাপ্তবয়স্ক যুবা পুরুষরা প্রকাশ্য স্থানে বিচরণ করিতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতে লাগিল। অনেকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র বাস উঠাইয়া লইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে এক অতি দুর্যোগের নিশায় আপনার পূর্বপুরুষ সদাশিবের কুটিরের দ্বারে করাঘাত শুনা গেল। সদাশিব দরিদ্র ব্রাহ্মণ, চোর-ডাকাইতের ভয় তাহার বিশেষ ছিল না। দুর্যোগে কোনও নিরাশ্রয় আসিয়াছে মনে করিয়া তিনি কপাট খুলিয়া অপরিচিত এক আগন্তুককে দেখিতে পাইলেন। মনুষ্যটি শীর্ণকায়, গুম্ফশ্মশ্রু সমন্বিত, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি হইতে পারে। আগন্তুক নিজের পরিচয় যাহা প্রদান করিল তাহা হইল, সে একজন জাদুকর। নানা স্থানে ঘুরিয়া সে জাদু প্রদর্শন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে। উপস্থিত দুর্যোগে বিপন্ন হইয়া আশ্রয়প্রার্থী। বলা বাহুল্য, অতিথি-বৎসল সদাশিব তাহাকে আশ্রয় দিলেন।”

“ইনিই কি জাদুকর গজানন?”

“আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়, ইনিই গজানন। নিরাশ্রয় বহিরাগত গজানন সদাশিবের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিল। নগরে যে একজন জাদুকর আসিয়াছে তাহা রটিতেও বিলম্ব হইল না।”

“গজানন কীরকম ম্যাজিক দেখাত তা আপনি জানেন?”

“লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া যাহা রটিত হইয়াছে তাহা জানি। বোধ করি অবহিত আছেন যে, সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি তিলকে তাল করিয়া থাকে।”

“জানি বইকী, খুব জানি।”

“গজাননের জাদুবিদ্যা সম্পর্কেও নানা কিংবদন্তি আছে, যাহা সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে নাকি প্রজ্বলিত অগ্নিতে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া থাকিতে পারিত, হস্ত দগ্ধ হইত না। জাদুদণ্ডের আঘাতে মুত্তিকায় প্রস্রবণ সৃষ্টি করিতে পারিত। সে নাকি মৃত্তিকার ঈষৎ উপর দিয়া অর্থাৎ শূন্যে পদক্ষেপ করিয়া বিচরণ করিতে পারিত।”

“এসব তো গাঁজাখুরি।”

“এই ব্যাপারে আমি আপনার সহিত একমত। তবে গজাননের খ্যাতি শুধু জাদুবিদ্যায় নহে। শুনা যায় রাজ্যে কোথাও কোনও ব্যক্তি বিপন্ন বা আর্ত হইয়া পড়িলে গজানন সেখানে হাজির হইয়া যাইত। এক ব্যক্তি নিশাকালে অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রকবলিত হইয়া পড়িয়াছিল। গজানন তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আর-এক ব্যক্তিকে সে কেবল স্পর্শ করিয়া নিরাময় করিয়াছিল। জলমগ্ন বালক-বালিকাকে উদ্ধার করা, সর্পাঘাতে অপমৃত্যু রোধ, ক্ষত পরিচর্যা ইত্যাদিতেই তাহার খ্যাতি

অধিক হইয়াছিল। গজাননের খ্যাতি ক্রমে তুঙ্গে উঠিতেছিল। রাজা মঙ্গলও তাহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের খ্যাতিহরণের কারক বলিয়া রাজা গজারা ইহাদের বেশি পছন্দ করেন না। রাজা মঙ্গল সুতরাং গজাননের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। উপরন্তু এক দিবস রাজা এক কাঠুরিয়াকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যখন তাহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন তখন অকস্মাৎ গজানন সেই মল্লভূমিতে আবির্ভূত হইয়া অসহায় ব্যক্তিটিকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিল, “মহারাজ, এই ব্যক্তি মল্লযুদ্ধের কিছু জানে না। ইহাকে পরাজিত করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিবেন কেন! আমার সহিত মল্লযুদ্ধ করুন। মহাশয়, বলাই বাহুল্য, রাজা মঙ্গলের অমিত শক্তির নিকট গজানন নিমেষে পরাজিত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। গজাননের উপর রাজার সঞ্চিত ক্রোধ তো ছিলই, সুতরাং রাজা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিয়া উপর্যুপরি আঘাত করিলেন। তাহাতেও মরিল না দেখিয়া শাসরোধ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,

গজানন মরিল না। রাজা যতই চেষ্টা করেন, যত ভয়ঙ্কর আঘাতই করেন, দেখা যায় গজানন দিব্যি বাঁচিয়া আছে এবং মুচকি-মুচকি হাস্য করিতেছে। তখন ক্রোধাবিষ্ট রাজা মঙ্গল সান্ত্রীদের একজনের কোষ হইতে তরবারি টানিয়া প্রথমে গজাননের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। অতঃপর হস্তপদাদিও কর্তিত করিলেন। মল্লভূমি গজাননের শোণিতে রঙ্গিল হইয়া গেল।"

"আপনি কি এই গল্প বিশ্বাস করেন?"

"আমি আপনাকে কাহিনীটি শুনাইতেছি মাত্র, বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনার উপর।"

"তারপর কী হল?"

"সে এক আশ্চর্য কাহিনী। দেখা গেল, গজাননের ছিন্ন মুণ্ডের চক্ষুদ্বয় পিটপিট করিতেছে, কর্তিত হস্তের অঙ্গুলিগুলি দিব্য নড়িতেছে, ছিন্ন পদযুগলও কম্পিত হইতেছে। অকস্মাৎ মুণ্ডটি শুন্যে উঠিয়া হঠাৎ গোলার মতো রাজা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইল। ২২

"ওঃ, এ যে আষাঢ়ে গল্প!"

"হাঁ মহাশয়, আর শুনিবেন কি?"

"হ্যাঁ, শুনব।"

"আষাঢ়ে গল্প হইলেও চিত্তাকর্ষক, কী বলেন?"

"আমি গল্পটা শুনছি গজানন লোকটাকে বুঝবার জন্য।"

"তাহা অনুমান করিতে পারি। নহিলে এই খর দ্বিপ্রহরে বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া রূপকথা শুনিবার মতো যথেষ্ট সময় যে আপনার হাতে নাই, তাহা না বুঝিবার মতো নির্বোধ আমি নহি।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"কহিতেছি মহাশয়। গজাননের মুণ্ড নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইয়া গিয়া রাজা মঙ্গলের উপর পড়িল। মল্লবীর মঙ্গল এতই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঘটনার আকস্মিকতায় নড়িতে পারেন নাই। প্রথম আঘাতেই তিনি ভূপাতিত হইলেন। তাহার পর মুণ্ডটি তাহাকে উপর্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত রাজা ক্রমে অবসন্ন ইয়া পড়িলেন। তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। অপরদিকে গজাননের হস্তপদাদিও বসিয়া নাই, বাম ও দক্ষিণ হস্ত ও দুই পদ শূন্যে ধাবিত হইয়া রাজার অমাত্য ও বশীভূত কর্মচারীদের ঘুষা ও পদাঘাত করিতে লাগিল। পিতা-মাতার নাম ধরিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহারা পলায়নপর হইল। কিন্তু বেশিরভাগই প্রহারে জর্জরিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল। রাজার প্রিয় জল্লাদ নফরচন্দ্রকে গজাননের দক্ষিণ হস্ত স্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিল। তাহার পর যাহা হইল তাহাও অপ্রত্যাশিত।"

"হাত-পা-মুণ্ডু সব জুড়ে গেল তো?"

"না মহাশয়। সেইখানেই বিস্ময়। গজাননের মুণ্ড ও হস্তপদাদি যে-যাহার নিজের মতো বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। কোনওটা বায়ু কোণে, কোনওটি নৈঋতে, কোনওটি পূর্বে, কোনওটি অগ্নি কোণে। সবশেষে ধড়টি ব্যোমমার্গে ধাবিত হইয়া অদৃশ্য হয়।"

"আসল ঘটনা বোধ হয়, গজানন রাজা মঙ্গলের হাতে মারা পড়ে। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে সে কোনওভাবে মঙ্গলকেও হত্যা করেছিল। সেটাই লোকের মুখে অতিরঞ্জিত হয়ে-"

"হইতে পারে। তবে আপনার পূর্বপূরুষ সদাশিব এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। অতিরঞ্জন যদি হইয়া থাকে তবে তাহাতে তাঁহারও অবদান আছে।"

"অতিরঞ্জন হতে পারে, আবার রূপকও হতে পারে।"

"সকলই সম্ভব। কিন্তু গজাননকে লইয়া আপনার কিছু সমস্যা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

"হ্যাঁ। সমস্যা গজাননের পুনরাবির্ভাব নিয়ে। অনেকেই দাবি করছে যে, জাদুকর গজানন বেঁচেবর্তে আছে। শুধু তাই নয়, গজানন তাদের সঙ্গে যোগাযোগও রক্ষা করে থাকে।"

"মহাশয়, এই লোকশ্রুতি আমার কানেও আসিয়াছে।"

"আমি এই গাঁজাখুরি গল্পটার শেষ দেখতে চাই। আমার ছেলে গজাননের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।"

শাসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "পৃথিবী বিচিত্র স্থান।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি নিঃসশয় নন।"

"না মহাশয়, কোনও ব্যাপারে আমি চূড়ান্ত মনোভাব পোষণ করি। তাহাতে আখেরে ঠকিতে হয়।"

"গজাননের পক্ষে বেঁচে থাকা কি সম্ভব?"

"বাঁচিয়া থাকা কতরকমের আছে, আপনি কি জানেন?"

৩. অঘোরকৃষ্ণবাবুর সময়টা

অঘোরকৃষ্ণবাবুর সময়টা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। গতকাল সন্ধেবেলা নাতি আর নাতনিদের সঙ্গে কুইজ কনটেস্টে গো-হারা হেরেছেন। মহাত্মা গাঁধীর বাবার নাম, মেরি গাইয়ের ইংরিজি প্রতিশব্দ আর ক্রিকেটে 'চায়নাম্যান' কাকে বলে তা বলতে পারেননি! অবশ্য তাঁর মনঃসংযোগ করতে না পারার যথেষ্ট কারণও ছিল। দিন চারেক আগে খুবই দামি একজোড়া নতুন চটি কিনেছেন। পরশুদিন তাঁর সেজো শালা হরিপদ ভুল করে সেই চটি পরে চলে গেছে। কাছেপিঠেনয়। হরিপদ গেছে নাগপুরে, বছরখানেকের মধ্যে তার আর আসার সম্ভাবনা নেই। কথাটা তুলতেই স্ত্রী ফোঁস করে উঠেছেন, "কেমন আক্কেল তোমার বলো তো! না হয় নিয়েইছে দেড়শো টাকার একজোড়া চটি, তাতে কোন রাজ্যপাট যেতে বসেছে তোমার! তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি, বুঝতে পারলে ঠিক পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবে।" পার্সেলের ভরসা অঘোরকৃষ্ণ করছেন না। মোটেই। বারবার চটিজোড়া যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। শুধু চটি হারানোর দুঃখই নয়, গদাধরের মতো আনাড়ির কাছে গত তিনদিনে বারসাতেক দাবায় হেরেছেন। পরশু বিকেলে তো গদাধরের বোড়ের মুখে গজটা চেপে দিতে গিয়ে ঘোড়ার চাঁটে গজ উড়ে গেল। নিজের আহাম্মকির জন্য নিজেরই দু'গালে থাবড়া মারতে ইচ্ছে যায়। আর শুধু কি তাই? পরশুদিন হরিহর হাই স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁকে সভাপতি করতে নিয়ে গিয়েছিল। সভাপতির কাজ বড্ড যাচ্ছেতাই, সারাক্ষণ ভ্যাজরং-ভ্যাজরং ভাষণ শুনতে হয়। তাই তিনি ভাষণের সময়টায় দিব্যি ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন। তারপর যখন তাঁর নিজের ভাষণ দেওয়ার সময় হল তখন চটকা ভেঙে উঠে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি যে কেন রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ার মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন, তা তিনি এখনও বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রোতারা সবাই হেসে ওঠায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "কাঁঠালপাড়া অতি ভাল জায়গা, রবীন্দ্রনাথ সেখানে জন্মালেও ক্ষতি ছিল না। কারণ কাঁঠালপাড়ায় অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন। যদিও কে কে

জন্মেছেন তা তাঁর ঠিক মনে পড়ছে না ইত্যাদি।" ফলে সভায় হাসির অট্টরোল উঠল। অঘোরকৃষ্ণবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে পড়লেন। আর সেখানেই শেষ নয়, গত কয়েকদিনে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। গতকাল কালু মুদির দোকানে তেরো টাকা বিয়াল্লিশ পয়সার সঙ্গে তেত্রিশ টাকা বাইশ পয়সা যোগ দিয়ে কী করে যে তিনি আটাত্তর টাকা আশি পয়সা হিসেব করলেন কে জানে। কালু খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "মেসোমশাইয়ের দেখছি ভীমরতি ধরেছে।"

এই যে এই অঞ্চলে লোকে তাঁকে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলে উল্লেখ করে, তা তো আর এমনিতে নয়। তাঁর প্রবল প্রতাপ, সাজ্ঘাতিক ব্যক্তিত্ব এবং দুর্দান্ত কর্তৃত্ব করার ক্ষমতার জন্যই খাতির করে লোকে তাঁর ওই নাম দিয়েছে। এর জন্য মনে-মনে তিনি খুশিই ছিলেন। কিন্তু এই পরশুদিন তাঁর বন্ধু ডি এম এস, জ্যোতিষার্ণব, সাহিত্য সরস্বতী, বিদ্যাবারিধি, পুরাণার্ণব, কাব্যশ্রী, রোগাভোগা নটবর হালদার তাঁর উত্তরের বারান্দায় বসে সকালবেলায় চা খেতে-খেতে হঠাৎ বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল। তার বক্তব্য, "বিজ্ঞান-টিজ্ঞান সব বোগাস, ওতে মানুষের কোনও কৃতিত্বই নাই। ভগবানই সব দিয়ে রেখেছেন, মানুষ শুধু ভগবানের নকল করে এসেছে এতকাল।"

অঘোরকৃষ্ণ চটে উঠে বললেন, "নকল মানে? মানুষ বুদ্ধি খাঁটিয়ে, সুক্ষ্ম হিসেবনিকেশ করে যে এত আবিষ্কার করল, তা নকল হতে যাবে কেন?"

তখন নটবর বলল, "আহা, বুদ্ধিটাও তো ভগবানই দিয়েছেন রে বাপু।"

তর্ক যখন তুঙ্গে উঠেছে তখনই নটবর বলে বসল, "অত তর্জন-গর্জন করছ কেন? তুমি কি বাঘ-সিংহী নাকি যে, তর্জন-গর্জনে ভয় খাব?"

তখন বুক চিতিয়ে অঘোরকৃষ্ণ বললেন, "আলবত বাঘ। লোকে আমাকে তা-ই বলে।"

"সেটা তোমার প্রশংসা করার জন্য বলে না, বলে তোমার গায়ের বোঁটকা গন্ধের জন্য।"

অঘোরকৃষ্ণ ভারী অবাক হয়ে বললেন, “বোঁটকা গন্ধ! আমার গায়ে বোঁটকা গন্ধ! কই, কোথায়?” বলে তাড়াতাড়ি নিজের গা শোঁকার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

নটবর বলল, “আহা, বোঁটকা গন্ধটা কথার কথা, বলছিলাম ওইরকমই কোনও হেঁদো কারণে তোমাকে সবাই বাঘ বলে হাসিঠাট্টা করে আর কি। তুমি তো আর আশু মুখুজ্জে নও কিংবা বাঘা যতীনের মতো লালমুখোদের সঙ্গে লড়াইও করোনি। তোমাকে বাঘ বললে বাঘেদের অপমানই হয়, তারা চাইলে তোমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করতে পারে।”

নটবরের মতো রোগাভোগা লোকও আজকাল তাঁকে অপমান করে যাচ্ছে, এটা খুবই ভাবনার কথা।

অঘোরকৃষ্ণের দুঃখের শেষ এখানেই নয়। তাঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। তাঁর বাবা হরিকৃষ্ণের বয়স এখন নব্বই। অতি শক্তসমর্থ হরিকৃষ্ণের এখনও মাথা-ভর্তি কাঁচা-পাকা চুল, মুখে বত্রিশটা শক্ত দাঁত। পাঁঠার হাড় চিবিয়ে খুঁড়ো করে ফেলতে পারেন। রীতিমত ডনবৈঠক করেন, মুগুর ভাঁজেন, পাঁচ-দশ মাইল টানা হাঁটতে পারেন। দাপটও প্রচণ্ড। রোজ সকালে বাবাকে প্রণাম করতে যান অঘোরকৃষ্ণ, আর প্রতিদিনই হরিকৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “কবে যে তুই একটা মানুষের মতো মানুষ হবি, সেটাই বুঝতে পারি না। রাত্রিবেলা বউমা এসে বলল, কালও নাকি তুই বাজার থেকে একটা কানা বেগুন এনেছিস। এখনও তুই নাকি পাতে নিম-বেগুন দিলে থালার নীচে চালান দিয়ে লুকিয়ে ফেলিস। সকালে দুধ খাওয়ার কথা, তা সেটা নাকি বেড়ালের বাটিতে চুপিচুপি ঢেলে দিয়ে আসিস। শুনতে পাই, সেদিন নাকি ব্রজমাস্টারকে বাজারে দেখেও পেন্নাম করিসনি! আর ইদানীং শুনতে পাচ্ছি, তুই নাকি দুপুরবেলায় ছাদে উঠে চারদিকে ঢিল মারিস!হরবাবুর বৈঠকখানার কাঁচ আর নবকৃষ্ণর মেটে কলসি নাকি তোর ঢিলেই ভেঙেছে!”

অভিযোগগুলো কোনওটাই মিথ্যে নয়। অঘোরকৃষ্ণ তাই মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকোতে থাকেন।

হরিকৃষ্ণ ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "অন্যগুলো তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু দুপুরবেলা ঢিল ছোঁড়াটা তো মোটেই কাজের কথা নয়। ঢিল মারিস কেন?"

অঘোরকৃষ্ণ মিনমিন করে বললেন, "আজ্ঞে চার-পাঁচটা হনুমান এসে ক'দিন ধরে বাগানে খুব উৎপাত করছে, সেইজন্যই ঢিল মেরে তাড়াচ্ছিলাম।"

হরিকৃষ্ণ বললেন, "হনুমানেরা চিরকালই গাছের কলাটা মুলোটা খেয়ে আসছে, তাই বলে ঢিল মারতে হবে?"

"আর হবে না।"

হরিকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠিন চোখে ছেলের আপাদমস্তক একবার

দেখে নিয়ে বললেন, "আর যেন তোমার সম্পর্কে কোনও নালিশ শুনতে না হয়-। এখন তুমি যেতে পারো।"

না, অঘোরকৃষ্ণ অনেক ভেবে দেখলেন, সময়টা তাঁর খারাপই যাচ্ছে। কারণ, দুপুরবেলা তিনি যখন ভাত খাওয়ার পর সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন তখনই তাঁর জানলার পাশে পেয়ারা গাছে হনুমানগুলো এমন দাপাদাপি শুরু করল যে, তিষ্ঠোতে না পেরে তিনি উঠে পড়লেন। ঢিল মারা বারণ, সুতরাং বেতের মজবুত লাঠিগাছ বাগিয়ে তিনি বাগানে ঢুকে যখন বীরবিক্রমে এগোচ্ছেন হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঢিল এসে তাঁর ডান কাঁধ ঘেঁষে মাটিতে পড়ল। অঘোরকৃষ্ণ আঁতকে উঠে চারদিকে চাইছেন। সঙ্গে-সঙ্গে উপর্যুপরি আরও তিন-চারটে বড় বড় ঢিল এসে গাছপালায় পড়তে লাগল। একটা পড়ল তাঁর বাঁ হাতের কবজিতে। তিনি ককিয়ে উঠলেন। আর-একটা সাঁ করে তাঁর মাথা ঘেঁষে কান ছুঁয়ে চলে গেল। কিন্তু ঢিলটা মারছে কে? ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা-এই সেই বৃত্তান্ত নয়তো।

তিনি সভয়ে একটা ঝুপসি আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে চারদিকে চাইতে লাগলেন।

হঠাৎ ছাদের দিকে নজর যেতেই তিনি হাঁ। স্পষ্ট দেখলেন ছাদে দাঁড়িয়ে বীরবিক্রমে ঢিল ছুড়ছেন তাঁর বাবা হরিকৃষ্ণ। হাতের শেষ ঢিলটা ছুঁড়ে হরিকৃষ্ণ আত্মতৃপ্তিতে হাতটাত ঝেড়ে আপনমনেই হেসে বললেন, "অপদার্থ! অপদার্থ! বুঝলে! অঘোরটা একেবারেই অপদার্থ। হাতে টিপ নেই মোটে, হনুমান মারতে গেছে! গিয়ে কার কাঁচ ভাঙছে, কার কলসি ভাঙছে। এ যুগের ছেলেদের কি আর সেই সাধনা আছে, না অধ্যবসায়? ঢিল ছুঁড়তেও তো এলেম দরকার রে বাপু!"

অঘোরকৃষ্ণের ভারী রাগ হল। কারণ, তাঁর বাবা হরিকৃষ্ণের হাতেও যে মোটেই টিপ নেই তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। এলোপাতাড়ি ছোঁড়া ঢিলগুলো একটাও কোনও হনুমানের গায়ে লাগেনি। বরং একটা ঢিল অঘোরকৃষ্ণের কবজি জখম করেছে, আর-একটা আর-একটু হলেই তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিত। কিন্তু এসব কথা হরিকৃষ্ণকে বলার মতো বুকের পাটা কার আছে! পৃথিবীতে চিরকালই অত্যাচারীরা অত্যাচার করে এসেছে, আর অত্যাচারিতরা মুখ বুজে থেকেছে। এই অবিচারের জন্যই তো লোকে কমিউনিস্ট হয়!

হরিকৃষ্ণ আবার ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছেন। ঠকাস-ঠকাস করে চারদিকে ঢিল এসে পড়ছে। মাথা বাঁচাতে অঘোরকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি দূরে সরে এলেন। একেবারে বাগানের পাঁচিলের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার কি জো আছে? হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে খুব অমায়িক গলায় বলল, "অঘোরবাবুর কি সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে?"

"কে?" বলে লাঠি বাগিয়ে অঘোরকৃষ্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন, যা দেখলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের ওপর গোঁফ-দাড়িওয়ালা

একটা লোক ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে। পরনে ময়লা একটা ছেঁড়া পাতলুন, গায়েও একটা আধময়লা বোম খোলা বিবর্ণ জামা। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তার দু'পাশে তিনটে-তিনটে করে মোট ছ'টা হনুমান বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে। এত নিশ্চিন্তে বসে থাকার কথা নয়, কারণ দেয়ালের ওপর কাঁচ আর পেরেক বসানো আছে।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে অঘোরকৃষ্ণ দাঁত কড়মড় করে বললেন, "তুমি কে হে বেয়াদব? দেয়ালে উঠেছ যে বড়! কী মতলব?"

লোকটা একগাল হেসে বলল, "মতলব কিছু খারাপ নয় মশাই। এই আপনাদের বাগানটা বসে বসে দেখছি।"

"বাগান দেখছ? না কি আর কিছু! আর ওগুলো নিশ্চয়ই তোমার পোষা হনুমান! আমার বাগানে কস্মিনকালে কখনও হনুমানের উৎপাত হয়নি! তাই ভাবি, হঠাৎ এখানে হনুমান এল কোত্থেকে! এখন বুঝতে পারছি, এ তোমারই কাজ।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে না, আমি কস্মিনকালেও কোনও হনুমান পুষিনি মশাই।"

"তা হলে ওগুলো তোমার কাছে অমন ভালমানুষের মতো বসে আছে কী করে?"

লোকটা একটু হেসে বলল, "জাতভাই মনে করেছে বোধহয়। আমি কি আর মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য? যেখানেই যাই, কুকুর-বেড়াল-পশু-পক্ষী পিছু নেয়। শুধু মানুষের কাছেই কলকে পাই না মশাই। এই একটু দেয়ালে উঠে আরাম করে বসে আছি বলে আপনি কত কথাই না শোনাচ্ছেন!"

অঘোরকৃষ্ণ হুঙ্কার দিলেন, "আরাম করে বসে আছ মানে! দেয়ালে কাঁচ নেই? পেরেক নেই?"

"থাকবে না কেন? খুব আছে।"

“সেগুলো ফুটছে না?”

লোকটা হেসে বলে, “গরিবের হল গিয়ে মোটা চামড়া। সারাজীবন কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরেই তো আমাদের চলা। ওসব কি আমাদের লাগে?”

“ওঃ, কথার দেখছি খুব বাহার! এখন ভালয়-ভালয় নামবে কি না!”

“কোনদিকে নামি বলুন তো! ভেতরে, না বাইরে? ভেতরে নামলে আপনি আমাকে পাকড়াও করতে পারেন। আর বাইরে নামলে আমি পালাতে পারি।”

“তোমাকে পাকড়াও করার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি তোমার হনুমানদের নিয়ে কেটে পড়।”

“আজ্ঞে, হনুমানগুলো যে আমার নয়।”

“আলবাত তোমার।”

“আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন। আমি দেয়ালে উঠে আপনাদের বাগানটা দেখছিলুম, হনুমানগুলো আপনার বাবামশাইয়ের ঢিলের ভয়ে গুটিগুটি এসে আমার দু’পাশে বসে পড়ল। তবে যা-ই বলুন, আপনার চেয়ে আপনার বাবামশাইয়ের ঢিলের হাত অনেক ভাল।”

অঘোরকৃষ্ণ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “ছাই ভাল, একটাও ঢিল হনুমানের গায়ে তো দুরের কথা, লেজেও লাগেনি। এলোপাতাড়ি ছুড়ছেন, একটু হলে আমার মাথাটাই ফাটত।”

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, “না মশাই, ন্যায্য বিচার যদি করতে হয় তবে আমি বলব, আপনার বাবামশাইয়ের হাতের জোর অনেক বেশি। কাল তো দেখলুম আপনার ঢিলগুলো ওই মাদার গাছটাও পেরোয়নি। আর আপনার বাবার ঢিল ওই জামগাছটা অবধি এসেছে।”

অঘোরকৃষ্ণ ভারী ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, “আমার হাতে জোর নেই বলছ? তা হলে হরবাবুর বৈঠকখানার কাঁচ আর নবকৃষ্ণর মেটে কলসি ভাঙলুম কী করে? অ্যাঁ?”

লোকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, “ওই আনন্দেই থাকুন। আপনার বাবামশাই কী কী ভেঙেছেন তা জানেন কি? তিনি পানুবাবুর শোয়ার ঘরের ড্রেসিংটেবিলের আয়না চুরমার করে দিয়েছেন, পানুবাবু থানায় যাওয়ার জন্য ধুতিতে মালকোঁচা মারছেন এখন। তা ছাড়া চৌধুরীবাড়ির ছাদের পাথরের পরীর একটা ডানা ঢিল মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে বাড়ির দরোয়ানরা ভয় খেয়ে খাঁটিয়ার তলায় ঢুকেছে বটে, তবে তারাও লাঠিসোঁটা নিয়ে এল

বলে! তার ওপর আপনার বাবামশাইয়ের ঢিলে কালীপদর নারকোল গাছ থেকে একটা নারকোল পড়ে তার পিসিমার টালির চাল ফুটো হয়ে গেছে। কালীপদর পিসিমা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে শাপশাপান্ত করছেন। না মশাই, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার বাবামশাইয়ের ঢিলের হাত আপনার চেয়ে ঢের ভাল।”

একথায় খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে অঘোরকৃষ্ণ বললেন, “থাক থাক, তোমাকে আর ফোঁপরদালালি করতে হবে না। সবাই হল শক্তের ভক্ত আর নরমের যম। বাবার হাঁকডাক আর দাপট বেশি বলেই সবাই তাঁকে তেল দেয়। তবে আমিও বলে রাখছি, এক মাঘে শীত যায় না। ঢিল মারা কাকে বলে তা আমিও দেখিয়ে দেব।”

লোকটা ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে উদাস গলায় বলল, “সত্যি কথা বললেই আজকাল লোকে চটে যায় দেখছি। তা আমি কী করব বলুন, নিজের চোখে যা দেখেছি তা অস্বীকার করি কী করে?”

“তার মানে তুমি রোজই এ-বাগানে হানা দাও!”

“তা দিই। গত বাইশ দিন ধরেই দিচ্ছি।”

অঘোরকৃষ্ণের চোখ কপালে উঠল, "অ্যাঁ! বাইশ দিন! তুমি তো ডাকাত হে! বলি তোমার মতলবখানা কী?"

লোকটা ঘাড় চুলকে বলে, "মতলব কিছু খারাপ ছিল না মশাই। গা ঢাকা দিয়ে কী করে বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায় তার সুলুকসন্ধান করছিলুম।"

"বলো কী? দিনে-দুপুরে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে চাও? সে কথা আবার বুক ফুলিয়ে বলছ?"

লোকটা বিমর্ষ গলায় বলে, "কী করব মশাই, রাতে যে আমার সুবিধে হয় না। তখন বড্ড ঘুম পায়।"

"এঃ, নবাবপুত্তুর! রাতে ঘুম পায়! চোর-ছ্যাঁচড়দের আবার রাতে ঘুম কিসের? অত আয়েসি হলে কি ও লাইনে চলে?"

লোকটা শুকনো মুখে বলে, "সেইজন্যই তো জীবনে উন্নতি হল মশাই! যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই পড়ে আছি।"

খুবই বিরক্ত হয়ে অঘোরকৃষ্ণ বললেন, "অপদার্থ! অপদার্থ। সাধনা নেই, অধ্যবসায় নেই, কাজে নেমে পড়েছেন! আর কাজের ছিরিই বা কী! দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে দেয়ালের ওপর উঠে বসে পাঁচজনের কাছে নিজেকে জাহির করছেন। আচ্ছা, লজ্জা সরম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে রে বাপু। এত আনাড়ি হলে কি চলে?"

লোকটা দুঃখিত মুখে তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলল, "আজ্ঞে অতি নির্জলা সত্যি কথা। কায়দাকানুন আমার বিশেষ জানা নেই। তা মশাই, আপনি যদি একটু সুবিধে করে দেন, তা হলে আমার বড় উপকার হয়।"

অঘোরকৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "কীসের সুবিধে হে? তোমার হয়ে কি চুরি-ডাকাতি করে দিতে হবে নাকি?"

লোকটা একগাল হেসে ভারী লজ্জার সঙ্গে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "অনেকটা সেরকমই আর কি।"

অঘোরকৃষ্ণ সমবেদনার সঙ্গেই বললেন, "বাপু হে, তুমি যখন কোনও কাজের নও তা হলে এ লাইনে এলে কেন?"

"পেটের দায়েই আসা মশাই। অন্য লাইনে সুবিধে হচ্ছিল না কি না।"

"তা আগে কী করতে?"

"সে শুনলে আপনি হাসবেন। ছিলুম বাজিকর। এই একটু-আধটু ম্যাজিক ট্যাজিক দেখাতুম।"

"বটে! ম্যাজিশিয়ান?"

"অনেকটা সেরকমই।"

"তা সেটা খারাপ কাজ হবে কেন? চুরির চাইতে তো ভাল।"

"পেট চালাতে পারলে খারাপ নয় বটে, তবে ওতেও বিশেষ সুবিধে হয়নি।"

"নাঃ, তুমি দেখছি কোনও কম্মের নও! ভেবেছিলুম তোমাকে চোর বলে ধরে নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে একটু বাহবা আদায় করব। এখন দেখছি তোমার মতো অপদার্থকে ধরে নিয়ে গেলে বাবা হেসেই খুন হবে।"

লোকটা জুলজুল করে অঘোরকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বলল, "তা এখন আমাকে অনেকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বটে, কিন্তু মশাই, একসময়ে আমারও একটু নামডাক হয়েছিল।"

"তাই নাকি? তা তোমার নামটা কী?"

"আজ্ঞে, জাদুকর গজানন।"

অঘোরকৃষ্ণের মুখে হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। বড়বড় চোখ করে চেয়ে বললেন, "কী-কী বললে যেন!"

"আজ্ঞে, জাদুকর গজানন।"

"গ- গ- গ..."

বলতে বলতে অঘোরকৃষ্ণ হঠাৎ চোখ উলটে মূর্ছিত হয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ওদিকে হরিকৃষ্ণ খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফের চারদিকে দুমদুম করে ঢিল ছুড়ছেন আর বিজয়গর্বে হাসছেন। এমন সময় হঠাৎ বাগানের একটা দুর্ভেদ্য কোণ থেকে একটা ঢিল উড়ে এসে ঠং করে জলের ট্যাঙ্কে লেগে ছিটকে এসে তাঁর মাথায় পড়ল। তিনি বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়লেন। ভাবলেন মাথাটা বোধ হয় দু'ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বুঝলেন তাঁর আঘাত তেমন গুরুতর নয়, আর ঢিলটাও ছোট। তখন তিনি রাগে লাফিয়ে উঠে রেলিঙের কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, "কে রে? কার এত সাহস? এমন বুকের পাটা কার?"

কেউ অবশ্য জবাব দিল না।

হরিকৃষ্ণ রাগে গরগর করতে করতে দোতলায় নেমে আলমারি থেকে বন্দুক বের করে বাগানে ছুটে গেলেন।

যেদিক থেকে ঢিলটা এসেছিল সেদিকটায় ঝোঁপঝাড় একটু বেশি। বন্দুক বগলে নিয়ে পাকা শিকারির মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন হরিকৃষ্ণ। হঠাৎ দেখতে পেরেন, পাঁচিলের কাছ বরাবর তাঁর বড় ছেলে অঘোরকৃষ্ণ দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে ঘাসজমির ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

হরিকৃষ্ণ কাছে গিয়ে ছেলের পেটে বন্দুকের নলের একটা খোঁচা দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমাকে না কতদিন দুপুরে ঘুমোতে বারণ করেছি! দুপুরে ঘুমোলে মানুষ অলস, বোকা আর অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আমার ভয়ে এখন ঘরে না ঘুমিয়ে লুকিয়ে বাগানে এসে ঘুমোতে শুরু করেছ! ছিঃ ছিঃ অঘোর, শেষমেশ এইরকম কপটতার আশ্রয় নেবে, এটা আমি ভাবিনি!"

অঘোরকৃষ্ণের ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। হরিকৃষ্ণ আরও কিছুক্ষণ তাঁর উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনামিশ্রিত একখানা ভাষণ দিলেন এবং তারপর বুঝতে পারলেন পরিস্থিতি কিছুটা গম্ভীর। বুঝতে পারলেন অঘোরকৃষ্ণ ঘুমোচ্ছেন না, অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর ভয় হল, একটু আগে তিনি যে দুর্দান্ত ঢিলগুলো মারছিলেন, তারই কোনওটা লেগে অঘোরকৃষ্ণের এই দশা হয়েছে কি না। কিন্তু তেমন কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না।

হরিকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বাগানে জল দেওয়ার লম্বা রবারের পাইপটা টেনে এনে অঘোরকৃষ্ণের মুখে চোখে জলের ছিটে দিলেন।

অঘোরকৃষ্ণ চোখ মিটমিট করে চাইলেন। তারপর পটাং করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "সর্বনাশ! লোকটা গেল কোথায়?"

হরিকৃষ্ণ অবাক হয়ে বললেন, "লোক! কোথায় তোক দেখলে হে তুমি?"

"ওই তো। পাঁচিলের ওপর বসে ছিল।"

"পাঁচিলের ওপর! তোমার কি মাথাখারাপ হল নাকি? পাঁচিলের ওপর পেরেক আর কাঁচ লাগানো, ওখানে কেউ বসতে পারে?"

"আজ্ঞে, নিজের চোখে দেখা।"

হরিকৃষ্ণ তাঁর বড় ছেলের ওপর বিশেষ আস্থা রাখেন না। একটা "হুঃ" দিয়ে বললেন, "তা লোকটা কি তোমাকে মারধর করেছে নাকি? হঠাৎ মূর্ছা গেলে কেন?"

"মূর্ছা যাব না! বলেন কী? আপনি হলেও মূর্ছা যেতেন।"

"বটে! কেন, লোকটার চেহারা কি খুব ভয়ঙ্কর? বাঁকানো শিং, বড়বড় মুলোর মতো দাঁত, কিংবা বাঘ-সিংহের মতো থাবা টাবা ছিল?"

"না না, ওসব নয়। রোগাভোগা চেহারা। তবে তার নাম যে জাদুকর গজানন!"

"অ্যাঁ!" বলে খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন হরিকৃষ্ণ। তাঁরও একটু মূর্ছার লক্ষণ দেখা গেল। চোখ দুটো একটু উলটে গেল, মাথা ঝিমঝিম করে একটু টলতে লাগলেন। বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তবে শক্ত ধাতের লোক বলে একটা গাছে ভর দিয়ে সামলেও গেলেন। তারপর বললেন, "অ্যাঁ। জাদুকর গজাননকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিলে?"

অঘোরকৃষ্ণ করুণ গলায় বললেন, "ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, হঠাৎ মূর্ছা যাওয়ায় ব্যাটা পালিয়ে গেছে।"

হরিকৃষ্ণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "মূর্ছা যাওয়ার আর সময় পেলে না তুমি? যখন-তখন মুছা গেলেই হল? ওরে বাপু, সব কিছুরই একটা সময় আছে। ওরকম মোক্ষম সময়ে কেউ মূর্ছা যায় বলে শুনেছ কখনও! এখনও ডিসিপ্লিন শিখলে না, আর কবে এসব শিখবে? পাঁচ লাখ টাকা হাতের মুঠোয় এসেও ফসকে গেল! মূর্ছা-টুছাগুলো যদি একটু আগে সেরে রাখতে তা হলে এমন দাঁওটা হাতছাড়া হত না। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে, জাদুকর গজাননকে ধরিয়া দিলে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার। গঞ্জের লোক হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে। আর সে নিজে এসে তোমাকে ধরা দিতে চাইল, তুমি গেলে মূর্ছা!"

অঘোরকৃষ্ণ একটু লজ্জিতভাবে বললেন, “জীবনে তো কখনও মুছা যাইনি, তাই মূর্ছা যাওয়ার নিয়মকানুনগুলো ভাল জানা ছিল না। লোকটা যখন বলল, আমার নাম গজানন' তখন আমি দেখলুম, দেয়ালের ওপর যেন পাঁচ লাখ টাকা বসে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে। এত কাছাকাছি পাঁচ লাখ টাকা বসে আছে দেখে মাথাটা কেমন করে উঠল যেন।”

“ওই তো তোমাদের দোষ। কোনও ব্যাপারে গা নেই, তৎপরতা নেই। পট করে লাফিয়ে গিয়ে সাপটে ধরবে তো! এঃ, ধরতে পারলে এতক্ষণে। তা যাক গে, বলি ঠিকানাটা কি জিজ্ঞেস করেছিলে?”

“আজ্ঞে না।”

“তোমাদের সব কাজই বড্ড কাঁচা।”

ঘটনাটা নিয়ে সন্ধের পর বাড়িতে একটা মিটিং বসল। সভার মধ্যমণি অবশ্যই হরিকৃষ্ণ। তাঁর সামনে তিন ছেলে অঘোরকৃষ্ণ, হরিৎকৃষ্ণ এবং নীলকৃষ্ণ। আর ছয় নাতি গন্ধর্ব, কন্দর্প, অশ্বিনী, ইন্দ্র, বরুণ, গণেশ। আর তাদের ছেলেপুলেরা।

হরিকৃষ্ণ খুব গম্ভীর মুখে বললেন, “মানুষের জীবনে সুবর্ণ সুযোগ খুব বেশি আসে না। আজ সুবর্ণ সুযোগটি শুধু এসেছিল তা-ই নয়, সে আমাদের বাড়িতে ঢুকতেও চেয়েছিল। হয়তো তার চুরিটুরির মতলবও ছিল। তা থাক। অঘোর যদি তাকে সেই সুযোগ দিত, তা হলে আমরা তাকে চোর-কুঠুরিতে বন্ধ করে রেখে মেঘনাদবাবুকে খবর পাঠিয়ে এবং তাঁর হাতে লোকটাকে তুলে দিয়ে এতক্ষণে পাঁচ লাখ টাকার মালিক হয়ে বসে থাকতাম। তাই বলছিলাম, সুবর্ণ সুযোগ যে কখন কোন পথে কোন ছদ্মবেশে আসে, সে বিষয়ে তোমরা হুশিয়ার থেকো।”

হঠাৎ গন্ধর্ব বলল, “আচ্ছা দাদু, এই মেঘনাদবাবুটি কে?”

হরিকৃষ্ণ বললেন, “একজন গণ্যমান্য লোকই হবেন। বিষাণ দত্ত জানে।”

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলে, "এই ধর্মনগর-শিবাইতলাতে আমাদের অন্তত চার পুরুষের বাস। এ অঞ্চলের সবাইকে চিনি। কিন্তু মেঘনাদবাবু বলে কারও নাম শুনিনি। ওরে, তোরা কেউ শুনেছিস?" বলে সে ভাইদের দিকে তাকাল।

সকলেই নেতিবাচক মাথা নাড়া দেওয়ায় হরিকৃষ্ণ একটু অস্বস্তিতে পড়ে বললেন, "নাম শোনোনি বলেই কি আর নেই নাকি? হয়তো দূরে থাকেন, হয়তো নতুন এসেছেন। বিষাণ উকিল মানুষ, কাঁচা কাজ করার লোক নয়।"

গন্ধর্ব বলল, "পোস্টারগুলো আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে গজাননকে ধরতে পারলে যেন বিষাণ দত্তকে খবর দেওয়া হয়।"

হরিকৃষ্ণ বললেন, "তা হলে তো সমস্যা মিটেই গেল। রামায়ণের মেঘনাদের মতো ইনিও আড়ালে থাকতে চাইছেন। তা থাকুন না। আমাদের তো তাঁকে দরকার নেই, দরকার তাঁর পাঁচ লাখ টাকার।"

গন্ধর্ব বলল, "না দাদু, আরও সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা?"

"সমস্যা জাদুকর গজাননকে নিয়ে। গজাননকে মেঘনাদ ধরতে চাইছে কেন?"

হরিকৃষ্ণ বললেন, "হয়তো গজানন মেঘনাদের ছেলেই হবে। কিংবা ভাই বা ভায়রাভাই যা তোক একটা কিছু হলেই হল। আমাদের অত খোঁজখবরে দরকার কী?"

"এ-ব্যাপারে বিষাণদাদুও ভেঙে কিছু বলছেন না। শুধু মুচকি হেসে বললেন, "লোকটাকে খুঁজে দিলে টাকা কিন্তু ঠিকই পাবে।' যেন টাকাটাই আসল, আর কিছু জানার দরকার নেই।"

হরিকৃষ্ণ উজ্জ্বল হয়ে বললেন, "আমিও তো তাই বলি। কাজ কী বাপু অত খোঁজখবরে! ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল।"

গন্ধর্ব গম্ভীর হয়ে বলল, "জাদুকর গজানন সম্পর্কে আরও একটু কথা আছে দাদু।"

"কী কথা?"

"আমাদের এক পূর্বপুরুষ ধর্মনগরে থাকতেন। তাঁর নাম সদাশিব। তিনি একজনকে নিয়ে একটা পুঁথি লিখেছিলেন। যাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন তিনিও একজন ভোজবাজিকর গজানন। এখনও গাঁয়েগঞ্জে বুড়ো মানুষরা তাঁর কিছু কিছু কাহিনী বলেন। অনেকের ধারণা, গজানন এখনও বেঁচে আছেন। যদিও সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হয় দুশো বছরের কাছাকাছি।"

হঠাৎ হরিকৃষ্ণ সোজা হয়ে বসে বলে উঠলেন, "তাই তো!"

সবাই তাঁর দিকে তাকাল।

হরিকৃষ্ণ বললেন, "কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। এ-গল্প আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি। ইনফ্যাক্ট এখনও আমাদের বাড়িতে বহু পুরনো আমলের কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত আছে। তার মধ্যে একটা ছোট ডিবের মতো কৌটোও ছিল। সেটায় হাত দিতে গিয়ে একবার ঠাকুমার কাছে বকুনি খেয়েছিলাম। ঠাকুমা বলেছিলেন, 'ওরে ও যে গজাননের জিনিস। ওতে হাত দিসনি, কুড়িকুষ্ঠ হবে, নির্বংশ হবি।' ভয়ে আর কখনও হাত দিইনি। তা গজানন একজন ছিল বটে, সে বহুঁকাল আগে মারা গেছে। হঠাৎ এখন তার কথা কেন? লোকে অনেক গাঁজাখুরি কথা বলে, ওতে কান দিও না।"

গন্ধর্ব বলল, "লোকের কথায় কান দিচ্ছি না। কিন্তু গজাননকে নিয়ে ইদানীং হঠাৎ নানা গল্প কেন ছড়াচ্ছে তা জানার জন্য আমার কিছু কৌতূহল হয়েছে। মেনে নিচ্ছি, এই গজানন সেই গজানন নয়। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, এই গজাননেরও কিছু রহস্য

আছে, নইলে জনৈক মেঘনাদবাবু হঠাৎ তাকে পাকড়াও করার জন্য পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করবে কেন? আরও প্রশ্ন, গজানন এবাড়িতেই বা হানা দিচ্ছে কেন?"

হরিকৃষ্ণ বললেন, "আমার মনে হয় এই গজানন একজন ফেরারি চোর বা ডাকাত। মেঘনাদবাবুর বাড়িতে বড়সড় চুরি বা ডাকাতি করে পালিয়েছে। তাই মেঘনাদবাবু হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছেন।"

গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলল, "চুরি বা ডাকাতির ব্যাপার হলে পুলিশের কাছে খবর থাকত। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, পুলিশের কাছে সেরকম কোনও অভিযোগ নেই। পুলিশ গজানন নামের কাউকে খুঁজছে না।"

হরিকৃষ্ণ বললেন, "সে যাই হোক, গজানন যে বদ মতলবেই এখানে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে গা-ঢাকা দিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢোকার সুযোগ খুঁজছিল। অঘোরকে সে নিজের মুখেই কবুল করেছে সেকথা। এমনকী বাড়িতে ঢোকার জন্য সে অঘোরের কাছে সাহায্যও চেয়েছিল।"

অঘোরকৃষ্ণ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "সেকথা সত্যি। চোর হলেও সে তেমন এফিসিয়েন্ট চোর নয়। বাইশ দিন ধরে সে নাকি এ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। পেরে ওঠেনি।"

গন্ধর্ব একটু হেসে বলে, "আপনারা কি এমন চোরের কথা শুনেছেন, যে নাকি গেরস্তর বাড়িতে ঢোকার জন্য গেরস্তরই সাহায্য চায়? একথা শুনলে যে লোকে হাসবে।"

৪. উকিল বিষাণ দত্তের পসার

উকিল বিষাণ দত্তের তেমন কোনও পসার নেই। কালেভদ্রে দু-একজন মক্কেল আসে। কিন্তু আজকাল তাঁর চেম্বারে এত ভিড় যে, ছুঁচ ফেলার জায়গা নেই।

বিস্তর মানুষ সঙ্গে একজন করে দাড়িগোঁফওয়ালা তোক ধরে এনেছে। কারও সাদা লম্বা দাড়ি, কারও ছাঁটা দাড়ি, কারও চাপ দাড়ি, কারও ছুঁচলো দাড়ি, কারও বা ফ্রেঞ্চকাট।

ফটিক দাস তার উলটোদিকে বসা হরেন বৈরাগীকে বলছিল, "বলি হরেন, শেষ অবধি নিজের খুড়োকেই কি জাদুকর গজানন বলে উকিলবাবুকে গছাতে নিয়ে এলে! না হয় তোমার খুডোর একটু মাথার দোষই আছে, তা বলে এরকম পুকুরচুরি করা কি ভাল?"

হরেন বৈরাগী একটু খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তুমিই বা কম যাচ্ছ কিসে ফটিকদা? তোমার পাশে উটি কে তা বুঝি জানি না? ও হল ময়নার হাটের চুড়িওলা নন্দকিশোর। কি বলল হে নন্দভায়া, ঠিক বলেছি?"

ফটিক একটু থতমত খেয়ে বলে, "আহা, অত চেঁচানোর কী আছে? এ নন্দকিশোর হতে যাবে কেন? চেহারার একটু মিল থাকতেই পারে। তা বলে"।

সাতকড়ি গায়েন ভজহরি মুৎসুদ্দিকে দেখে আঁতকে উঠে বলে, "ভজহরিদাদা যে! তোমার সঙ্গে উটি কে বলো তো! চেনা-চেনা ঠেকছে!"

"আরে না না, চেনা-চেনা ঠেকবে কী? এ হল জাদুকর গজানন, অনেক মেহনত করে ধরতে হয়েছে রে ভাই।"

"কিন্তু এ তো খালপাড়ার বটকৃষ্ণ বলে মনে হচ্ছে যেন!"

নগেন হালদার তার সঙ্গে আসা দাড়িওয়ালা লোকটাকে নিচু স্বরে বোঝাচ্ছিল, “ওরে বাপু, ঘাবড়ানোর কী আছে বলো তো! যদি গজানন বলে পাশ হয়ে যাও তা হলে তো পাঁচ লাখের এক লাখ তোমাকে দেবই।”

“কিন্তু মশাই, ওরা যদি আমাকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলায়?”

“দুর বোকা, ওসব নয়। মনে হচ্ছে মেঘনাদবাবু কোনও গুরুতর কাজের ভার দেবেন বলেই গজাননকে খুঁজছেন। আর ধরো, যদি তোমার ভালমন্দ কিছু হয়েই যায়, তা হলে তোমার বউকে গুনে গুনে এক লাখ দিয়ে আসব কথা দিচ্ছি।”

“না বাবু, বড্ড ভয়-ভয় করছে। পেটের দায়ে এলুম বটে। কিন্তু শেষ অবধি”

রাম খাজাঞ্চি হঠাৎ একজনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, “আরে কে ও? শ্যামাপদ নাকি হে? সঙ্গে কে বলো তো! আরে এ তো হরিপুরের সেই কাপালিকটা!”

শ্যামাপদ গম্ভীরভাবে বলল, “তুমি চোখের চিকিৎসা করাও হে রাম! আমার কাছে কেউ কখনও ভেজালের কারবার পায়নি। ন্যায্য জিনিস বরাবর ন্যায্য দামে বিক্রি করে এসেছি। এর বাপ-পিতেমোর দেওয়া নাম গজানন কি না একেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।”

বীরু মণ্ডল একটু নিচু গলায় হরিপদ ঘোষকে বলল, “এঃ হে। হরিপদদা, লোকটার গালে যে নকল দাড়ি সেঁটেছ তা আঠাটা ভাল করে লাগাবে তো! বাঁ দিকের জুলপির নীচে আলগা হয়ে আছে যে।”

হরিপদ শশব্যস্তে সঙ্গী লোকটার দাড়িটা চেপে বসাতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, “মানুষটা মেকআপের কিছুই জানে না দেখছি, সাতটা টাকা জলে ফেললুম।”

সত্যচরণের সঙ্গে একজন দাড়িওলার একটু তর্কাতর্কি হচ্ছে। দাড়িওলা বলছিল, “মশাই, গজাইয়ের দোকানের গরম রসগোল্লা খাওয়ানোর কড়ার করিয়ে নিয়ে এলেন, তা কোথায় কী? এতক্ষণ বসিয়ে রাখছেন, লোকের খিদেতেষ্টা পায় না নাকি?”

সত্যচরণ বলছিল, “ওরে বাপু, হবে, হবে। কাজটা ভালয়-ভালয় উতরে দাও, রসগোল্লা যত চাই পাবে। ফট করে আবার নিজের পৈতৃক নামটা বলে ফেলো না। হুশিয়ার থেকো।”

“কিন্তু রসগোল্লা কি গরম থাকবে? ঠাণ্ডা মেরে যাবে যে! না মশাই, এ কাজ আমার পোযাচ্ছে না।”

উকিলবাবুর মুহুরি এসে এক-একজনকে ভেতরে উকিলবাবুর ঘরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

নবকৃষ্ণের ডাক পড়তেই সে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গের লোকটাকে নড়া ধরে টেনে তুলে বলল, “চলো হে, ডাক পড়েছে। এঃ, ঘুমে যে একেবারে কাদা হয়ে ছিলে বাপু! কোঁচার খুঁটে মুখের নালঝোল একটু মুছে নাও।”

উকিলবাবুর ঘরে বিষাণ উকিল গম্ভীর মুখে বসে আছে। নবকৃষ্ণ ঢুকেই হাসি-হাসি মুখে বলল, “ওঃ কী পরিশ্রমটাই না গেছে উকিলবাবু, আর বলবেন না। হরিপুর থেকে সেজো শালা খবর পাঠাল যে, দাড়িগোঁফওলা গজাননকে কালীতলার হাটে দেখা গেছে। অমনি ছুট-ছুট, কালীতলার হাট কি এখানে! তারপর সেখানে গিয়ে খবর পেলুম, গজানন পালিয়ে নয়নপুরের তেঁতুলতলায় গয়েশ ষড়ঙ্গীর বাড়িতে ঢুকেছে। তা সেখানে গিয়ে–”

বিষাণ দত্ত খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবকৃষ্ণের সঙ্গে আসা লোকটাকে দেখছিল। হঠাৎ বলল, “কপালের বাঁ ধারে আঁঠাটা কোথায় গেল?”

“অ্যাঁ!”

“তা ছাড়া, গজাননের নাকের ডগায় তিল আছে।”

নবকৃষ্ণ চটে উঠে বলল, “তা সেটা আগে বলবেন তো। ঝুটমুট হয়রানি হল মশাই। গজানন চেয়েছিলেন, ধরে এনেছি। এখন আব চাইছেন, তিল চাইছেন, এর পর হয়তো টাক চাইবেন, টিকি চাইবেন। এত আশা থাকলে কাজ হয়?”

বিষাণ দত্ত একটু মৃদু হেসে বলে, "ওরে বাপু, যার জিনিস সে তো পছন্দ করে নেবে! যাকে-তাকে নিলেই তো হবে না। পাঁচ-পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কি ভেজাল জিনিস নেবে নাকি?"

নবকৃষ্ণ গজগজ করতে করতে বিদেয় হল, এল রাধাগোবিন্দ হাইত, সঙ্গে একজন কোলকুঁজো তেকেলে বুড়ো, বিশাল পাকা দাড়ি। রাধাগোবিন্দ কপালের ঘাম হাতের কানা দিয়ে মুছে একটা শাস ছেড়ে বলল, "ওঃ, গজানন তো নয়, যেন পাঁকাল মাছ। যতবার ধরি, পিছলে যায় মশাই। শেষে কি করলুম জানেন, মাছ ধরার জাল দিয়ে সাতপুরার বাজারের কাছে বাছাধনকে ধরে ফেললুম। দেখেশুনে নিন, একেবারে পাক্কা গজানন।"

বিষাণ দত্ত মাথা নেড়ে বলল, "ওঁকে চিনি হে, উনি হলেন ক্ষেমঙ্করী দাসী মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের রিটায়ার্ড পণ্ডিতমশাই। কানেও শোনেন না, চোখেও ভাল দেখেন না, ভুজুং-ভাজুং দিয়ে আনলে নাকি?"

রাধাগোবিন্দ জিভ কেটে বলে, "আজ্ঞে না, অতবড় ভুল হওয়ার নয় আমার। দেখেশুনেই এনেছি।"

"ভুল একটু হয়েছে বাপু, ইনি গজানন তর্কতীর্থ। বুড়ো মানুষটাকে আর কষ্ট দিও না। জায়গামতো রেখে এসো।"

একের পর এক গজানন বাতিল হয়ে ফিরে যেতে লাগল। নিতাই সাহা তো বলেই গেল, "আমার গজাননকে যদি আপনার পছন্দ না হয় তা হলে ধরতে হবে খাঁটি গজানন আপনি ভূভারতে পাবেন না।"

একেবারে শেষে মুহুরি যাদের ধরে নিয়ে এল তারা হল গন্ধর্ব আর শাসন ভট্টাচার্য।

বিষাণ দত্ত বলল, "গন্ধর্ব যে! তা তোমার সঙ্গেও একজন গজানন দেখছি নাকি? তা এঁর তো দেখছি দাড়িগোঁফ নেই!"

গন্ধর্ব বলল, “না, ইনি গজানন নন। এঁর নাম শাসন ভট্টাচার্য। আমরা একটু জরুরি কথা জানতে এসেছি।”

“বোসো বোসো, রোজ দশটা-বিশটা গজানন সামলাতে সামলাতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। আমার এখন গজানন ফোবিয়া হয়েছে।”

গন্ধর্ব আর শাসন বসল। গন্ধর্ব বলল, “গজাননকে নিয়ে যে চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেছে তা আমরাও টের পাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না গজাননকে কার এত দরকার।”

বিষাণ দত্ত গম্ভীর হয়ে বলল, “আমার এক মক্কেলের।”

শাসন ভট্টাচার্য বলল, “মহাশয়, আমরা মেঘনাদবাবু সম্পর্কে কিছু জানিতে চাই। ইনি কে এবং কী উদ্দেশ্যে জাদুকর গজাননকে খুঁজিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়।”

বিষাণ দত্ত ভ্রূ তুলে বলে, “ও বাবা, আপনি যে সাধুভাষায় কথা কন দেখছি!”

“আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, ইহাই আমাদের বংশের রীতি।”

“রীতি! এ-আবার কীরকম রীতি মশাই?”

শাসন বিনীতভাবে বলে, “আমাদের বংশে দেবভাষায় বাক্যালাপেরই প্রথা ছিল। আমার প্রপিতামহ পর্যন্ত এই ভাষাতেই কথা কহিতেন। আমার পিতামহ ছিলেন আইনজীবী। তিনি দেখিলেন সংস্কৃতে কথা কহিলে মক্কেল বুঝিতে পারে না, বিচারপতি আপত্তি করেন, সাক্ষীগণ এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেয়। অগত্যা জীবিকার প্রয়োজনে তিনি দেবভাষার পরিবর্তে সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিতে শুরু করেন। তদবধি আমরা এই ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।”

“আপনার দাদু তা হলে উকিল ছিলেন? কী নাম বলুন তো!”

“আজ্ঞা, ব্রজমাধব ভট্টাচার্য।”

“হ্যাঁ, খুব নাম ছিল তাঁর। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তা কী জানতে চান বলুন।”

“মহাশয়, আমরা মেঘনাদবাবু সম্পর্কে জানিতে আগ্রহী।”

বিষাণ দত্ত বলল, “মেঘনাদবাবু সম্পর্কে যে আমিও ভাল জানি তা নয়। মাসখানেক আগে এক দুর্যোগের রাতে ভ ভদ্রলোক এসে হাজির। ওই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে কারও ঘরের বাইরে বেরনোর কথাই নয়, তাই আমি লোকটিকে দেখে খুব অবাক হই। তাঁর গায়ে বেশ দামি পোশাক ছিল। জরির কাজ করা একটা জামা, ধাক্কা পাড়ের ধুতি, সবই অবশ্য ভিজে সপসপ করছিল। মাথায় বাবরি চুল, বিশাল পাকানো গোঁফ আর গালপাট্টায় যাত্রাদলের রাজা বলে মনে হচ্ছিল।”

“মহাশয়, মেঘনাদবাবুর আকৃতিটি কীরূপ ছিল?”

“সে কথাই বলছি। বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখে মনে হয় ব্যায়ামবীর বা কুস্তিগির কিছু একটা হবেন। চোখদুটোও বেশ ভয়ঙ্কর। তাকালে বুকটা গুড়গুড় করে।”

“মহাশয়, মেঘনাদবাবু কি একা ছিলেন?”

“হ্যাঁ। তবে মশাই, এসব কিন্তু গুহ্য কথা। মেঘনাদবাবু তার কথা কর্তাকে বলতে নিষেধ করে গেছেন। নিতান্তই গন্ধর্বকে ছেলেবেলা থেকে চিনি আর আপনি ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের নাতি বলেই বলছি। পাঁচকান করবেন না কিন্তু।”

“না মহাশয়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অগ্রে কহুন।”

“লোকটিকে দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। মেঘ ডাকলে যেমন শব্দ হয়, ওঁর গলাটাও তেমনই সাঙ্ঘাতিক। নিজের পরিচয় দিলেন, ওঁর নাম মেঘনাদ রায়। কাছে ধর্মনগরে ওঁর বাড়ি। ব্যবসাবাণিজ্য আছে। এও বললেন, “বিশেষ জরুরি দরকারেই উনি

এসেছেন। উনি একজনের সন্ধান চান। সন্ধান পেলে সন্ধানদাতাকে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার দেবেন। তখন আমি বললাম, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান পেতে হলে পুলিশের কাছে যাওয়াই ভাল। উনি মাথা নেড়ে বললেন, "না, পুলিশকে তিনি জড়াতে চান না। তিনি চান গোটা মহল্লায় গজাননের সন্ধান করা হোক। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি লোকটার সন্ধান চাইছেন। উনি শুধু বললেন, "গজানন ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিন্তু সম্প্রতি উনি স্মৃতিভ্রংশ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। গজাননের সন্ধান না-পাওয়া পর্যন্ত উনি শান্তিতে থাকতে পারছেন না। সেইজন্য উনি আমার সাহায্য চান। আমি বললাম, এটা তো উঁকিলের কাজ নয়। উনি তখন আমাকে মোটা টাকা ফি দিলেন। বললেন, "আমাকে উনি বুদ্ধিমান লোক বলে মনে করেন। তা ছাড়া পোস্টার দিলে বা ঢ্যাঁড়া পেটালে পুলিশ হয়তো এ-নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে, আমি উকিল বলে সেটা সামলাতে পারব।"

"মহাশয়, গজাননের সন্ধান পাইলে উনি যে প্রতিশ্রুত পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন তাহার নিশ্চয়তা কী?"

বিষাণ দত্ত একটু দোনোমনো করে বললেন, "আপনারা চেনা লোক বলেই বলছি। উনি পাঁচ লাখ টাকা আমার কাছেই গচ্ছিত রেখে গেছেন। আমি অবশ্য আপত্তি করেছিলাম। গাঁ-গঞ্জ জায়গা, চুরি-ডাকাতি হতে কতক্ষণ? উনি কথাটা গায়ে মাখলেন না। বললেন, "চুরি-ডাকাতি যাতে না হয় তার দিকে তিনি লক্ষ রাখবেন এবং তা সত্ত্বেও যদি চুরি-ডাকাতি হয় তবে তিনি আমাকে দায়ী করবেন না। এ-টাকার রসিদও তিনি নেননি।"

"মহাশয়, আপনি আইনজীবী, স্বভাবতই সন্দিহান স্বভাবের। আপনার লোকটিকে সন্দেহ হইল না?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে। ধর্মনগরে লোক পাঠিয়ে খোঁজ-খবরও নিয়েছি। তবে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে যাকগে, পারিশ্রমিক পেয়ে কাজ করছি, আমার আর বেশি জেনে কী হবে?"

“জাদুকর গজাননকে পাইলে মেঘনাদবাবুকে কীরূপে খবর দিবেন তাহা ভাবিয়াছেন কি?”

“না, ভাবিনি। তিনি বলে গেছেন গজানন ধরা পড়লে তিনি লোকমুখে ঠিকই খবর পেয়ে যাবেন।”

“মহাশয়, উনি জাদুকর গজাননের কীরূপ বিবরণ দিয়াছেন?”

“শুধু বিবরণ নয়, উনি একটি ছবিও আমাকে দিয়ে গেছেন। এই যে।”

বলে ড্রয়ার থেকে তুলট কাগজে আঁকা একটা বেশ পুরনো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি বের করে শাসনের হাতে দিল বিষাণ। হেসে বলল, “কপালের বাঁ ধারে একটা আব আছে, নাকে তিল। কিন্তু মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর দাড়ি-গোঁফ থাকায় মুখশ্রী বোঝা দুষ্কর। গজানন যদি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলে থাকে, তা হলেই চিত্তির।”

শাসন আর গন্ধর্ব মিলে ছবিটা ভাল করে দেখল। ভুষো কালি জাতীয় কিছু দিয়ে আঁকা ছবি। কাগজটায় নানারকম দাগ লেগেছে। ফলে ছবিটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু গজাননের দু’খানা চোখ যেন মোহময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে গন্ধর্ব বলল, “জাদুকর গজাননকে মাঝে-মাঝে যে দেখা যাচ্ছে সেকথা জানেন কি বিষাণদা?”

“খুব জানি। সে নাকি ভেসে-ভেসে বেড়ায়। যতসব গাঁজাখুরি গপ্পো। কিন্তু টাকার লোভে কত লোক যে সাজানো গজানন নিয়ে আসছে তার হিসেব নেই। আজ তো শুনলুম কে যেন তার নিজের খুড়োকে গজানন সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল।”

“হাঁ মহাশয়, একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছে।”

“কিন্তু আপনারা এব্যাপারে ইন্টারেস্টেড কেন তা জানতে পারি?”

শাসন একটু চিন্তা করে বলল, "কিংবদন্তির পিছনে ধাবন করা আর মরীচিৎকার পিছনে ছুটিয়া যাওয়া একই ব্যাপার। তবে মহাশয়, কিংবদন্তি বলিতেছে প্রায় দুই শত বৎসর বয়ঃক্রমের গজানন আজিও জীবিত। গন্ধর্ববাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। আমি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করি না। সম্ভবত বিষয়টি লইয়া মস্তক ঘর্মাক্ত করিতে হইত না। কিন্তু চিন্তার উদ্রেক হইতেছে মেঘনাদবাবুর আবির্ভাবে। ইনি কোথা হইতে কী উদ্দেশ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং কী কারণে পঞ্চ লক্ষ মুদ্রায় গজাননকে ধরিতে চাহিতেছেন তাহাই রহস্য। জাদুকর গজানন তাঁহার প্রিয়পাত্র, এই কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

বিষাণ দত্ত বলল, "কেন বিশ্বাসযোগ্য নয় বলুন তো!"

শাসন বলল, "তাহা বলিতে পারি না। মহাশয় কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস করেন?"

"কথাটা শুনেছি। টের তো পাই না।"

"মনে হয় ওইরূপ কোনও ইন্দ্রিয়ই আমাকে ইহা বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিতেছে। কথাটা হয়তো বিজ্ঞানসম্মত হইল না। কিন্তু আমি নাচার। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

"করুন।"

"মেঘনাদবাবু আপনাকে বিশ্বাস করিয়া পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা বিনা রসিদে দিয়া গেলেন, ইহা কিন্তু অদ্ভুত। ইচ্ছা করিলে আপনি এই টাকার কথা তো অস্বীকার করিতে পারেন।"

"হ্যাঁ, সেটাও অদ্ভুত বইকি! পাঁচ লক্ষ টাকা তো সোজা নয়!"

"মহাশয়, আমার মনে হয়, মেঘনাদবাবু ভাল করিয়াই জানেন যে, ওই টাকা আত্মসাৎ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ মেঘনাদবাবু উহা আপনার নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিবার মতো ক্ষমতা রাখেন।"

"তার মানে?"

“তিনি আপনাকে হয়তো প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন নাই, কিন্তু তার নিজের বাহুবলের উপর প্রগাঢ় আস্থা আছে।”

বিষাণ দত্ত একটু নড়েচড়ে বসে বলল, “লোকটা কি ষণ্ডাগুণ্ডা নাকি?”

মাথা নেড়ে শাসন বলে, “তাহা বলিতে পারি না। তবে মহাশয় বোধ করি কোনও সাধারণ শৌখিন মানুষের সঙ্গে লেনদেনটি করিতেছেন না। মেঘনাদবাবু প্রয়োজনে তাহার টাকা আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন।”

“চিন্তায় ফেললেন মশাই!”

“চিন্তা এক অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। মহাশয়, ব্যাপার আবার পূর্বাপর ভাবিয়া দেখুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন।”

বেরিয়ে এসে নির্জন, অন্ধকার রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গন্ধর্ব জিজ্ঞেস করল, “কী বুঝলেন শাসনবাবু?”

শাসন মৃদুস্বরে বলল, “কিছুই বুঝি নাই মহাশয়, কেবল কয়েকটি অসংলগ্ন অনুমান করিতেছি মাত্র।”

“আমি তো কিছু অনুমানও করতে পারছি না।”

“পরিস্থিতি তদ্রুপই বটে! একটার সহিত অন্যটা মিলিতেছে না, যুক্তি হার মানিতেছে।”

“তাই বটে!” ঠিক এ-সময়ে পেছন থেকে হঠাৎ কী একটা ভারী জিনিস বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে শাসনের মাথা ঘেঁষে সামনে ঠঙাত করে পড়ল।

“বাপ রে!” বলে গন্ধর্ব মাথা চেপে বসে পড়ল।

শাসন ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকার রাস্তায় খুব অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত কোনও গাছের আড়ালে সরে গেল বলে মনে হল তার।

"মহাশয়, আলোটি প্রজ্বলিত করুন।"

গন্ধর্ব উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে পেছনটা দেখল। ফাঁকা রাস্তা।

"কী ব্যাপার বলুন তো!" হতভম্ব গন্ধর্বের প্রশ্ন।

"মহাশয়, আমরা আক্রান্ত।"

"কিন্তু কেন?"

"বাতিটি ধরুন।" বলে নিচু হয়ে শাসন যেটা কুড়িয়ে নিল তা সাধারণ ইট-পাটকেল নয়, একটা মাঝারি আকারের লোহার ভারী বল।

"দেখিতেছেন মহাশয়, এই লৌহগোলকটি আমার মস্তকে লাগিলে করোটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।"

"অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।"

"হাঁ মহাশয়। খুবই অল্পের জন্য।"

"চলুন তো, দেখি বেয়াদবটা কে?" শাসন ম্লান হেসে বলল, "বেয়াদবটি আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। তবু চলুন।"

পিছিয়ে গিয়ে তারা চারদিকে টর্চের আলো ফেলে দেখল। কাউকে দেখা গেল না।

"কে হতে পারে বলুন তো!"

শাসন উদাস গলায় বলল, "আবার অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বরং বিষয়টি লইয়া আরও একটু চিন্তা করা যাউক। চলুন মহাশয়, অগ্রসর হই।"

"কিন্তু আমায় যদি মারে?"

"আততায়ী পলাইয়াছে। পুনরাক্রমণের আশঙ্কা সম্ভবত নাই। তবে সতর্ক হইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ প্রয়োজন।"

"কী ছুঁড়ে মেরেছিল বলুন তো!"

"অনুমান করি ইহা পুরাতন আমলের অব্যবহৃত কামানের গোলা।"

"সর্বনাশ! ওটা পেল কোথায়?"

"আততায়ীদের নানা পন্থা আছে।"

গন্ধর্বের গা একটু ছমছম করছে। সে বলল, "আমার বাড়ি তো সামনে, কিন্তু আপনাকে তো দু' মাইল হাঁটতে হবে। আজ রাতটা থেকে যান।"

"না মহাশয়, অদ্য আর কিছু হইবে না।"

৫. প্রথমে দেখেছিল অবু

প্রথমে দেখেছিল অবু। সন্ধের পর তার হঠাৎ খেয়াল হল, গুলতিটা বাগানে ফেলে এসেছে। তারা তিন ভাই আর পাড়ার কয়েকটা ছেলে মিলে যখন মার্বেল খেলছিল তখন পকেট থেকে গুলতিটা বের করে রেখেছিল গাছের একটা ফোকরে। আনতে ভুলে গেছে। সকালে আনলেও চলবে। কিন্তু পড়তে বসার পর বারবার গুলতিটার কথা মনে হচ্ছিল বলে পড়ায় মন দিতে পারছিল না। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এলেই হয়! লাগবে তো এক মিনিট।

একটা বড় টেবিলের চারধারে তারা পড়তে বসে। নিকু, বিকু, লীলা, ছবি, পুতুল। একটু বাদেই মাস্টারমশাই আসবে।

অবুকে উঠতে দেখেই বড়দি লীলা গম্ভীর হয়ে বলল, "এই, কোথায় যাচ্ছিস?"

"এই আসছি একটু বাথরুম থেকে।"

"একটু আগেই তো বাথরুম গিয়েছিলি।"

"নাকে হাত দিয়েছি তো, হাতটা ধুয়েই আসছি।"

বলে আর দাঁড়াল না অবু। ঘর থেকে বেরিয়ে এক ছুটে নীচে নেমে সোজা আমগাছের দিকে ছুটল। জায়গাটা অন্ধকার। তবে চেনা জায়গা বলে অবু টক করে গিয়ে গুলতি আর কয়েকটা পাথরের টুকরো বের করে নিল। আর তখনই ওপরদিক থেকে কার যেন কথা শুনতে পেল সে। খুব মৃদু গলায় কে যেন বলছে, "সদাশিবের বাড়িটা যে কোথায় গেল! কিছুই চিনতে পারি না যে!"

অবু এত ভয় পেল যে, শরীরটা শক্ত হয়ে গেল তার। গায়ে কাঁটা দিল। বুকের মধ্যে রেলগাড়ির শব্দ হতে লাগল যেন। তাকাবে না

মনে করেও সে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে তাকিয়ে প্রথমে কাউকেই দেখতে পেল না। একটু তাকিয়ে থাকতেই দোতলায় তাদের পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে যে আলোটা আসছিল তার আবছা আলোয় সে দেখতে পেল, উঁচু একটা ডালে পা ঝুলিয়ে একটা লোক বসে আছে যেন!

"ভূত! ভুত! ভূত!"

খুব চেঁচাল অবু, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না। সে হাঁ করে চেয়ে রইল। দৌড়ে পালানোর মতো পায়ের জোরও যেন নেই। সে শুধু কাঁপছে ঠকঠক করে।

লোকটা ফের আপনমনে বলল, "কিছুই যে খুঁজে পাচ্ছি না! সব ভুলে গেছি।"

হঠাৎ অবুর মনে হল, এ-লোকটা জাদুকর গজানন নয় তো! যাকে ধরার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে! আর এই জাদুকর গজাননই তো দিন-দুই আগে তার দাদুর হাতে আর একটু হলে ধরাই পড়ে যেত, কিন্তু দাদু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় ধরতে পারেনি। আর সেইজন্য কর্তাবাবার কাছে বকুনিও খেয়েছে। খুব। গজানন যদি হয়, তা হলে ভূত নয়। এটা মনে করতেই তার ভয়টা চলে গেল। সে টক করে গুলতিতে একটা পাথর ভরে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে দিল সেটা।

"উঃ!" বলে একটা আর্তনাদ করে লোকটা বুক চেপে ধরল দু'হাতে। তারপর টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল নীচে।

কিন্তু অবু হাঁ হয়ে দেখল, ওই অত উঁচু থেকে লোকটা পড়ল খুব আস্তে-আস্তে, পাখির পালকের মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে। উলটে পালটে খুব ধীরে-ধীরে লোকটা মাটিতে নেমে দু' পায়ে দাঁড়াল। দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মুখ। বুকটা এখনও দু'হাতে চেপে ধরে আছে।

তার দিকে চেয়ে লোকটা খুব করুণ গলায় বলল, “আমাকে মারলে?”

“আ-আপনি কে?”

“আমি জাদুকর গজানন। আমাকে মেরো না। আমি চোর নই।”

“আপনি কি ভূত?”

“কী জানি! বুঝতে পারি না বাবা।”

হঠাৎ অবুর বড্ড মায়া হল। গুলতি মেরেছে বলে কষ্টও লাগছিল তার। সে বলল, “আপনার কি খুব লেগেছে?”

“হ্যাঁ বাবা।”

“আমি অন্যায় করেছি। ভয় পেয়ে গুলতি মেরেছিলাম।”

“আমাকে ভয় পেও না।”

“আপনি গাছ থেকে পড়ে গেলেন, কিন্তু লাগল না তো!”

“নাঃ। আমি বড় হালকা হয়ে গেছি।”

“আপনি কি জাদুকর?”

“হ্যাঁ।”

“আপনাকে ধরার জন্য পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।”

“জানি বাবা। সেইজন্যই পালিয়ে-পালিয়ে থাকি।”

“কিন্তু অনেক লোক যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।”

লোকটা জুলজুল করে অবুর দিকে চেয়ে বলল, “ধরা পড়ে যাব নাকি? তা হলে যে বড় বিপদ হবে।”

“আপনি কোথায় থাকেন? আপনার বাড়ি নেই?” লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “কিছু মনে পড়ে না এখন। ছিল কোথাও, কোনওদিন।”

“আপনার মা নেই? বাবা নেই?”

লোকটা মাথা নাড়া দিয়ে বলে, “না বাবা। কেউ নেই আর। শুধু আমি আছি।”

অবু কিছুক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। লোকটার জন্য তার এত দুঃখ হতে থাকে যে, চোখে জল আসে। সে ধরা গলায় বলল, “আমাদের কাছে থাকবেন?”

লোকটা জুলজুল করে চেয়ে তাকে দেখে নিয়ে একটু হাসে, “আমাকে কোথায় রাখবে বাবা?”

“আমাদের বাড়িটা অনেক বড়। নীচের তলায় অনেক ঘর আছে, যেখানে কেউ কখনও ঢোকে না। তালাবন্ধ পড়ে থাকে। আমরা যদি সেখানে আপনাকে লুকিয়ে রাখি?”

লোকটা খুব হাসল, বলল, “তুমি বড় ভাল ছেলে। আচ্ছা, এখানে সদাশিব রায়ের বাড়ি কোথায় জানো?”

“না তো!”

“আমি তার বাড়িটা খুঁজছি। বড্ড দরকার।”

“ও নামে তো এখানে কেউ থাকে না।”

“অনেকদিনের কথা। কোথায় যে গেল তার বাড়িঘর!”

“আপনি আমাদের কাছে থাকুন। কোনও ভয় নেই। আমরা আপনাকে ধরিয়ে দেব না।”

লোকটা তেমনই সুন্দর করে হাসে, “পারবে লুকিয়ে রাখতে?” ঘাড় বেঁকিয়ে অবু বলে, “পারব। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।”

নীচের তলায় দক্ষিণের দিকের ঘরে বিস্তর পুরনো জিনিসের ডাঁই। সেখানে কেউ কখনও ঢোকে না। ভাঙা চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাতিদান এইসব। অবু মাঝে-মাঝে এ-ঘরটায় ঢুকে বসে থাকে। বসে বসে আকাশপাতাল ভাবে।

অবু আগে দেখে নিল নীচের তলার পেছনের প্যাসেজে কেউ আছে কি না। কেউ অবশ্য এদিকে আসে না বড় একটা। তবু সাবধানের মার নেই। অবু চুপি-চুপি ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বাঁ ধারের দরজার ভেতরদিকে ঝোলানো চাবিটা বের করে এনে তালা খুলল।

তারপর দৌড়ে বাগানে এসে জাদুকর গজাননের হাত ধরে বলল, “আসুন।”

গজানন হাসল। তারপর ধীর পায়ে আসতে লাগল তার সঙ্গে। কিন্তু হেঁটে হেঁটে নয়, যেন ভেসে ভেসে। অনেক সময়ে মাটিতে পা স্পর্শ করছে না।

“আপনি কি ভেসে বেড়াতে পারেন?”

“আগে বায়ুবন্ধন করতাম। তাই থেকেই বোধ হয় এমন হয়েছে।”

ঘরে এনে সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অবু বলল, “আলো জ্বাললে বাইরে থেকে দেখা যাবে। অন্ধকারে কি আপনার অসুবিধে হবে?”

লোকটা বলল, “আমার আলো লাগে না তো! আমি সব দেখতে পাচ্ছি।”

“দেখতে পাচ্ছেন?”

"হ্যাঁ। ওই তো, জানলার ধারে একটা আরামকেদারা, পাশে একটা গোল টেবিল। ঠিক বলেছি?"

অবু অবাক হয়ে বলে, "হ্যাঁ। একদম ঠিক। আপনি ওখানে বসে বিশ্রাম করুন। আমি রাতে আপনার খাবার নিয়ে আসব। এখন আমি পড়তে যাচ্ছি। মাস্টারমশাই বসে আছেন।"

"যাও বাবা।"

অবু বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা প্যান্টের পকেটে পুরে ওপরে ছুটল।

আজ পড়াশোনায় তার একদম মন লাগছিল না। তিনটে অঙ্ক ভুল করে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেল। ট্রানস্লেশন করতে গিয়ে যাচ্ছেতাই গণ্ডগোল হল। অবশেষে মাস্টারমশাই চলে যাওয়ার পর হাঁফ ছাড়ল।

তারপর ভাইবোনদের ডেকে সে গোপন মিটিং করতে বসল। জাদুকর গজাননের কথা সব জানিয়ে সে বলল, "তোমরা যদি চাও তা হলে আমরা সবাই মিলে জাদুকর গজাননকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু কেউ একজনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না, বলে দিলাম। আমি তোমাদের সাহায্য চাই। যদি কারও অমত থাকে তা হলে আগেই বলে দাও, আমি জাদুকর গজাননকে চলে যেতে দেব।"

বিকু অবাক হয়ে বলে উঠল, "সে কী? আমি তো জাদুকর গজাননের দেখা পাওয়ার জন্য কবে থেকে বসে আছি। সত্যি বলছিস অবু?"

"হ্যাঁ দাদা, সত্যি। তা হলে তোমরা রাজি?"

সকলেই রাজি, শুধু বড়দি, পনেরো বছর বয়সী লীলা বলল, "কিন্তু লোকটা যদি চোর বা ডাকাত হয়?"

অবু মাথা নেড়ে বলল, "জাদুকর গজানন চোর বা ডাকাত যে নয় তা তোমরা তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"তা হলে আমিও রাজি।"

"আমরা সবাই আমাদের খাবারের ভাগ নিয়ে গিয়ে ওঁকে খাওয়াব। আর পালা করে পাহারা দিতে হবে, যাতে হুট করে ওই ঘরের দিকে কেউ না যায়।"

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে।" ছয় ভাইবোন চুপিসারে নীচে নেমে এল।

অবু দরজা খুলতে খুলতেই শুনতে পেল গজানন মৃদুস্বরে বলে যাচ্ছে, "সদাশিবের বাড়িটা যে কোথায় গেল! এখন তাকে কোথায় খুঁজে পাই?"

তারা ছয় ভাইবোন ঘরে ঢুকে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। সকলেরই বুক ঢিব ঢিব।

অন্ধকারে হঠাৎ দু'খানা চোখ ঝলসে উঠল, ভয় পেয়ে লীলা চেঁচিয়ে উঠেও মুখ চাপা দিল হাত দিয়ে।

গজানন খুব নরম গলায় বলল, ভয় কী খুকি? দুঃখী মানুষকে ভয় পেতে নেই। তোমরা আমার কাছে এসো।"

তারা জড়োসড়ো হয়ে আস্তে-আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিকু বলল, "আপনি কি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"বলুন তো আমি ফরসা না কালো!"

“তুমি খুব ফরসা। তোমার বাঁ গালে একটা তিল আছে। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে কাটা দাগ।”

বিকু অবাক হয়ে বলল, “কী করে দেখতে পাচ্ছেন?”

“জানি না বাবা, তবে পাই।”

“আমাদের ম্যাজিক দেখাবেন না?”

“ম্যাজিক! সেই কবে দেখাতাম! ভুলেই গেছি প্রায়। অনেকদিন চর্চা নেই কিনা, তবে এই দ্যাখো একটা সোজা ম্যাজিক।”

বলতেই হঠাৎ একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। দেখা গেল জাদুকর গজাননের ডান হাতের তর্জনীটা মশালের মতো জ্বলছে।

পুতুল সবচেয়ে ছোট। সে ভয় পেয়ে বলে উঠল, “আঙুল পুড়ে যাবে যে! নিভিয়ে ফেলুন।”

“তোমরা আমাকে দেখতে এসেছ তো, এই আলোয় দেখে নাও।”

বিকু বলে, “আপনি সত্যিই শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন?”

“হ্যাঁ বাবা, পারি, তবে আজকাল কেন যে আপনা থেকেই ভেসে ভেসে যাই কে জানে।”

ওপর থেকে ঠাকুমার ডাক শোনা গেল, “ওরে তোরা কোথায় গেলি এই রাতে? খেতে আয়!”

পুতুল বলল, “খুব খিদে পেয়েছে তো আপনার! চুপটি করে থাকুন। আমি একটু বাদে এসে আপনার খাবার দিয়ে যাব।”

একটু হেসে আঙুলের আগুন নিভিয়ে ফেলে গজানন বলল, “তোমরা বড্ড ভাল।”

বিকু বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না, এখানে কেউ আপনাকে খুঁজে পাবে না।"

ঘরে তালা লাগিয়ে সবাই ওপরে ছুটল খেতে।

খেতে বসে সবাই টপাটপ রুটি-তরকারি লুকিয়ে ফেলতে লাগল পকেটে বা জামার তলায়। রান্নার ঠাকুর সুদর্শন অবাক হয়ে বলল, "আজ দেখছি সকলেরই খোরাক বেড়ে গেছে। পুতুল অবধি সাতখানা রুটি নিয়েছে। কী ব্যাপার রে বাবা!"

সবাই একসঙ্গে গেলে বাড়ির লোকের সন্দেহ হবে বলে অবু আর পুতুল আঁচানোর সময় টুক করে নীচের তলায় নেমে এল। পুতুলের হাতে একটা বাটিতে গজাননের জন্য রুটি আর তরকারি। অবুর হাতে এক গ্লাস জল।

ঘরে ঢুকে তারা অবাক হয়ে দেখল, গজানন আরাম কেদারার ওপর শূন্যে ভেসে শুয়ে আছে। চোখ বোজা। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার একটু আলো এসে পড়েছে তার মুখে। ঠোঁটে একটু হাসি। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে মুখোনা!

পুতুল আস্তে করে ডাকল, "তুমি কি ঘুমোচ্ছ গজাননদাদা?"

গজানন চোখ চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "না। ঘুম কি আসে! চোখ বুজে পুরনো যত কথা ভাবছিলাম, কত কথা!"

"এই নাও, তোমার জন্য খাবার এনেছি।"

গজাননের মুখে একটা শিশুর মতো হাসি ফুটে উঠল, হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিয়ে বলল, "ওঃ কত খাবার! তোমরা বুঝি নিজেরা কম খেয়ে আমার জন্য নিয়ে এলে বাবা? কিন্তু আমি কি এত খেতে পারি?"

পুতুলের চোখ ছলছল করছে। সে ফিসফিস করে বলল, "খাও গজাননদাদা, তুমি যে বড্ড রোগা!"

গজানন একটুখানি খেল, বাকিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “এটা নিয়ে যাও, কাককে দিও, কুকুরকে দিও, পিপঁড়েকে দিও, ইঁদুরকে দিও, সবাইকে দিতে হয়, একা খেতে নেই।”

পা টিপে টিপে তারা যখন দোতলায় উঠল তখন বৈঠকখানায় কর্তাবাবা সিংহের মতো পায়চারি করছেন আর বলছেন, “এ তো মগের মুল্লুক হয়ে উঠল দেখছি! আজ কামানের গোলা ছুঁড়ে মেরেছে, কাল হয়তো অ্যাটম বোমাই ছুঁড়ে মারবে! কাল থেকে তোমরা সবাই মাথায় হেলমেট বা সোলার হ্যাঁট পরে বেরোবে আর ছাতা খুলে নিয়ে হাঁটাচলা করবে। আমার তো মনে হয় এ সেই গজাননেরই কাজ। বাড়িতে ঢুকবার তালে ছিল, না পেরে প্রতিশোধ নিচ্ছে।”

পুতুলের বাবা গন্ধর্বকুমার বলল, “না দাদু, তা বোধ হয় নয়। শুনেছি গজানন রোগাভোগা মানুষ। অত ভারী গোলা ছুঁড়ে মারার ক্ষমতা তার নেই। এটা যে ছুঁড়েছে সে পালোয়ান লোক।”

“পালোয়ান! এখানে আবার পালোয়ান কে আছে? থাকার মধ্যে তো আছে আমি আর সাতকড়ি। সাতকড়ি একসময়ে লোহার মোটা মোটা রড দু’হাতে পেঁচিয়ে ফেলত, ঘুসি মেরে কংক্রিটের চাঁই ভেঙে ফেলত, কিন্তু তারও তো বয়স হয়েছে রে বাপু। আর আছি এই আমি, শটপাটে বরাবর ফার্স্ট, দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় তিনবারের গোল্ড মেডালিস্ট...”

গন্ধর্বকুমার মিনমিন করে বলল, “যে-ই তোক গজানন নয়, আমাদের মনে রাখা দরকার, গজানন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ সদাশিব রায়ের বন্ধু।”

“ধুস, ওই গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করো নাকি তুমি। ওরে বাপু, মানছি, সদাশিব রায় আর গজাননে গলাগলি ছিল, তা বলে গজানন কি আর দুশো বছর বেঁচে আছে? তুমি না সায়েন্সের লোক?”

“আগে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে।”

"গুলি মারো সন্দেহে। গজানন বলে যে লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে একটা জোচ্চোর, ইমপস্টার।"

পুতুলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, সে ফিসফিস করে বলল, "এই সেজদা শুনছিস কী বলল?"

অবু মন দিয়ে শুনছিল, বলল, "শুনেছি।"

"তা হলে সদাশিব রায় আমাদের পূর্বপুরুষ!"

"হ্যাঁ, আর গজাননদাদা সবাশিব রায়ের বাড়িই খুঁজে বেড়াচ্ছে। "

"তা হলে কি আমাদের বাড়িটাই খুঁজছে?"

"বাঃ, আমরা সদাশিব রায়ের বংশধর না? এই বাড়িই তো খুঁজবে।"

"চল সেজদা, খবরটা গজাননদাদাকে দিয়ে আসি।" দু'জনে দৌড়ে নীচে নেমে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকল। পুতুল ডাকল, "গজাননদাদা! ও গজাননদাদা! কোথায় তুমি?" সিলিঙের কাছ থেকে গজাননের জবাব এল, "এই যে বাবা আমি। নীচে বড় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল বলে একটু ওপরে এসে শুয়ে আছি।"

"তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম। শোনো, এটাই সদাশিব রায়ের বাড়ি।"

"অ্যাঁ!" বলে ধীরে ধীরে গজানন নেমে এল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে একটু হেলেদুলে গেল।

"হ্যাঁ গো, এইমাত্র জানতে পারলাম সদাশিব রায় আমাদেরই পূর্বপুরুষ।"

গজাননের সমস্ত মুখটাই এমন আলো হয়ে গেল যে, অন্ধকারেও তাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল, মুখে শিশুর মতো সেই হাসি৷ মাথা নেড়ে বলল, “এই বাড়ি! এই সদাশিবের বাড়ি? তোমরা সব সদাশিবের বংশধর?”

“হ্যাঁ গো গজাননদাদা!”

“আমারও সন্দেহ ছিল, এই বাড়িই হবে। রায়বাড়ি তো এখানে একটাই। কিন্তু সদাশিবের বাড়ি তো মাঠকোঠা ছিল তাই ধন্দ লাগছিল। একবার ঝড়বৃষ্টির রাতে সদাশিব আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড্ড ভাল লোক ছিল সে। আর সেজন্যই তোমরাও এত ভাল।”

“কিন্তু তুমি সদাশিবের বাড়ি খুঁজছিলে কেন?”

“বড্ড দরকার। তার কাছে যে আমার ডিবেটা ছিল।”

“কীসের ডিবে?”

“একটা ছোট্ট সোনার কৌটো, তার মধ্যে আমার নস্যি আছে।”

“নস্যি! এ মা, তুমি নস্যি নাও?”

“সে ঠিক নস্যি নয় গো বাবারা। সেটা একটা জড়িবুটি। ওইটে পাচ্ছি না বলে আমার কিছু মনে পড়ে না, খিদে পায় না, দিন দিন হালকা হয়ে যাচ্ছি। ওই জড়িবুটি না হলে এখন যদি কেউ আমাকে কেটে ফেলে তা হলে আর জোড়াও লাগব না যে!”

অবু একটু বিস্মিত হয়ে বলে, “তোমার বয়স কত গজাননদাদা?”

“অনেক গো, অনেক, হিসেব নেই।”

অবু বলে, “এটা সদাশিবের বংশধরদের বাড়ি বটে, কিন্তু তোমার ডিবেটা এখনও আছে কি না তা আমরা জানি না, তুমি এই ঘরে যেমন আছ তেমনই লুকিয়ে থাকো, আমরা ভাইবোনেরা মিলে ঠিক তোমার কৌটো খুঁজে বের করব।”

খুব হাসল গজানন, মাথা নেড়ে বলল, “বড্ড ভাল হয় তা হলে, তোমরা যে বড্ড ভাল।”

“তা হলে তুমি এখন ঘুমোও!”

“হ্যাঁ বাবারা, আজ বুকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। সদাশিবের বাড়ি খুঁজে পেয়েছি। আজ আমার ঘুম হবে।”

দুই ভাইবোন আবার চুপিসারে ওপরে উঠে এসে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল।

৬. মধ্যরাত্রে ছয়টি হনুমান

মধ্যরাত্রে ছয়টি হনুমান রায়বাড়ির বাগানের পাঁচিলে পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। খুবই চুপচাপ।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার কুঁড়ে কালো পোশাক-পরা একটা বিশাল চেহারার লোক এসে লোহার ফটকের সামনে দাঁড়াল। পেছনে আরও জনাসাতেক ষণ্ডামার্কা মানুষ। প্রত্যেকের মুখেই রাক্ষসের মুখোশ। দু'জনের হাতে বন্দুক, দু'জনের হাতে বল্লম, তিনজনের হাতে লোহার রড। বিশালদেহী লোকটার হাতে তলোয়ার।

একজন নিঃশব্দে ফটকের তালাটা লোহার রডের চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। দুটো কুকুর হঠাৎ ডেকে উঠল। কিন্তু তেড়ে এসেও ভয় পেয়ে কেঁউ কেঁউ করে পালিয়ে গেল।

আটজন তোক দ্রুতপায়ে বাগানটা পেরিয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে সদর দরজাটা ঠেলে দেখল। বন্ধ।

ছ'টা হনুমান হঠাৎ হুপ-হুঁপ করে ডাক ছাড়তে-ছাড়তে গাছের ডাল বেয়ে দ্রুত বাড়ির পেছনদিকে চলে যাচ্ছিল।

হনুমানের শব্দে বিশালদেহী লোকটা চকিতে একবার ঘুরে বাগানটা দেখে নিল। রাত্রিবেলা হনুমানের এরকম আচরণ স্বাভাবিক নয়।

একজন বন্দুকধারী বলল, "গুলি চালাব?"

“না। দরজা ভাঙো।” পুরনো আমলের নিরেট কাঠের মজবুত দরজা। কিন্তু বিশাল মুশকো চেহারার দু-দুটো লোকের জোড়া-জোড়া লাথি পড়তে লাগল দরজায়। দুমদুম শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠল। বাড়ির লোকজন ঘুম ভেঙে “কে? কে?” করে চেঁচাতে লাগল।

হরিকৃষ্ণ রায় জানলা দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, “এই কে রে? কার এত সাহস? গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব কিন্তু!”

কেউ কোনও জবাব দিল না। দরজাটা লাথির চোটে নড়বড় করতে লাগল। বাড়ির ভেতরে চেঁচামেচি বাড়ছে। পুরুষদের সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা আর বাচ্চারাও চেঁচাচ্ছে, “ডাকাত! ডাকাত! মেরে ফেললে!”

দরজাটা দড়াম করে খুলে হাঁ হয়ে গেল।

খোলা তলোয়ার হাতে প্রথমে বিশালদেহী লোকটা এবং তার পিছু পিছু সাতজন সশস্ত্র লোক গটগট করে ভেতরে ঢুকল।

টর্চ ফেলে সিঁড়িটা দেখে নিয়ে সর্দার লোকটা বলল, “ওপরে চলো।”

ওপরে সিঁড়ির মুখেই হরিকৃষ্ণ বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে। “কে? কে তোমরা? খবর্দার আর এগিয়ো না বলছি..”

তাঁর মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই সর্দার নোকটা কোমর থেকে একটা ছোরা টেনে এনে ফলাটা দু’আঙুলে ধরে বিদ্যুদ্বেগে ছুঁড়ে মারল।

“বাপ রে!” বলে বন্দুক ফেলে বসে পড়লেন হরিকৃষ্ণ। ছোরাটা তাঁর বাহুমূলে বিধে গেছে।

“বাবা! বাবা!” বলে অঘোরকৃষ্ণ, হরিকৃষ্ণ, নীলকৃষ্ণ, গন্ধর্বরা সব ছুটে এসে ধরল তাঁকে।

লোকটা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, “কেউ বাধা দিও না, মরবে।” গন্ধর্ব বলল, “কী চান আপনারা?” ৬৮

“এ বাড়ির পুরনো জিনিসপত্র কোথায় থাকে?” গন্ধর্ব ভয়-খাওয়া গলায় বলে, “ভাঙা আসবাবপত্র নীচের তলায়।”

“ওসব নয়। আমরা একটা কৌটো খুঁজছি। সোনার কৌটো। কোথায় থাকে পুরনো জিনিস?”

অঘোরকৃষ্ণ বললেন, “পুরনো জিনিস কিছু নেই।”

সদার লোকটা চোখের পলকে অঘোরকৃষ্ণের মুখে একটা ঘুসি মারল। অঘোরকৃষ্ণ ঘুসি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

হরিকৃষ্ণ ক্ষতস্থান চেপে ধরে মুখ বিকৃত করে বললেন, “খামোখা মারধর করছ কেন বাপু? আমাদের সিন্দুকে কিছু পুরনো জিনিস আছে, দাঁড়াও, বের করে দেওয়া হচ্ছে। গন্ধর্ব, যাও তো আমার বিছানা শিয়রের লোশকের তলায় চাবি আছে, নিয়ে এসো।”

গন্ধর্ব দৌড়ে গিয়ে চাবি নিয়ে এল।

“কোথায় সিন্দুক আছে নিয়ে চলো। চালাকি করলে মেরে ফেলব।”

গন্ধর্ব তাদের পুরনো দলিল-দস্তাবেজের সুরক্ষিত ঘরটা খুলে দিয়ে বলল, “ওই যে সিন্দুক।”

বজ্রগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল, “খোলো!”

গন্ধর্ব সিন্দুক খুলে পুরনো ভারী পাল্লাটা টেনে তুলল। ভেতরে মূল্যবান বাসন-কোসন, গয়নার বাক্স, রুপোর জিনিস, মোহর, রুপোর বাঁট লাগানো ছোরা থরেথরে সাজানো। লোকটা একটা-একটা করে জিনিস তুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ঘরের মেঝেয়। ছড়িয়ে গেল মোহর, রুপোর টাকা, গয়না, আরও কত জিনিস।

লোকটা হিংস্র গলায় বলল, “কৌটোটা কোথায়?” গন্ধর্ব মাথা নেড়ে বলে, “জানি না। যা আছে এখানেই আছে।”

গন্ধর্বের গালে একটা বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে লোকটা বলল, “চালাকি হচ্ছে?”

গন্ধর্ব চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

লোকটা ফিরে সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে বলল, “কৌটোটা এবাড়িতেই আছে। তোমরা লুকিয়ে রেখেছ। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি কৌটো বের করে না দাও তা হলে এক-এক করে সবাইকে কেটে ফেলব।”

বাড়ির সবাই হাঁ। মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিকৃষ্ণ ছোরাটা বাহুমূল থেকে বের করেছেন। তাঁর ক্ষতস্থানে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল তাঁর মেজো ছেলে হরিৎকৃষ্ণ। হরিকৃষ্ণ ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বললেন, “বাপু হে, কৌটোটা কেমন দেখতে তা বললে না হয় হদিস দিতে পারি।”

“ছোট একটা সোনার কৌটো। কারুকাজ করা। বের করো, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেই।”

হরিকৃষ্ণের জামাকাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তবু তিনিই সবচেয়ে কম ঘাবড়েছেন। বললেন, “ওঃ, তা হলে বোধ হয় গজাননের কৌটোটার কথাই বলছ বাপু।”

লোকটা একটা বাজখাঁই ধমক দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, সেটাই। এক্ষুনি বের করো।”

হরিকৃষ্ণ বললেন, “ওটাও সিন্দুকেই ছিল। ভাল করে দ্যাখো, একটা লাল শালুতে মোড়া কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে।”

“না, নেই। তোমরা কৌটোটা লুকিয়ে রেখেছ।” হরিৎকৃষ্ণ বললেন, “আমার বাবা মিথ্যে কথা বলেন না।”

“চোপরও!” বলে লোকটা হঠাৎ একটা লাথি মেরে হরিকৃষ্ণকে সাত হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিল।

সবাই আঁতকে চেঁচিয়ে উঠতেই লোকটা ধমক দিয়ে বলল, “খবর্দার। টু শব্দ নয়। চার মিনিট হয়ে গেছে। আর এক মিনিট মাত্র সময় আছে তোমাদের হাতে।”

দেখতে-দেখতে এক মিনিটও কেটে গেল।

সর্দার তার তলোয়ারটা তুলে তার একজন সঙ্গীকে বলল, “ওই বুড়ো লোকটার মুণ্ডুটা নামিয়ে ধরো। প্রথমে ওকে দিয়েই শুরু করা যাক।”

মুগুরের মতো হাতওয়ালা একটা লোক এগিয়ে এসে হরিকৃষ্ণের মাথাটা ধরে নামিয়ে রাখল। সর্দার তলোয়ারটা তুলতেই একটা কচি গলা শোনা গেল, “তোমরা এই কৌটোটা খুঁজছ?”

সর্দার তলোয়ার সংবরণ করে ফিরে চাইল।

পুতুল এগিয়ে এসে তার কচি দুটো হাতে-ধরা সোনার কৌটোটা তুলে দেখাল।

সর্দার ছোঁ মেরে তার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখল, “হ্যাঁ, এই তো সেই কৌটো! কোথায় পেলে?”

“এটা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল।”

সর্দার কৌটোটার ডালা খুলে দেখল। তার মুখোশ-ঢাকা মুখে হাসি ফুটল কি না বোঝা গেল না। তবে সে যেন একটু খুশির গলায় বলল, “হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।”

পুতুল অবাক চোখে বিশাল চেহারার মানুষটাকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দেখছিল। বলল, "এই কৌটোয় কী আছে?"

"তুমি খুলে দ্যাখোনি তো?"

"না। ডালাটা খুব শক্ত করে আটা ছিল। আমি খুলতেই পারিনি।"

"ভাল করেছ। এতে একটা বিষ আছে।"

"তোমরা আমাদের আর মারবে না তো!"

"না। শুধু একটা কথা!"

"কী কথা?"

"গজানন নামে কাউকে তোমরা দেখেছ?"

"কীরকম দেখতে?"

"গোঁফদাড়ি আছে। লোকটা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। দেখেছ?"

"না তো!"

"সে কখনও যদি এই কৌটোর খোঁজে আসে, তা হলে তাকে বোলো কৌটোটা আমি নিয়ে গেছি।"

"তুমি কে, তা তো জানি না।"

"আমার নাম মাণ্ডুক।"

"তোমার মুখে মুখোশ কেন?"

“আমাকে দেখলে সবাই ভয় পায়, তাই মুখোশ পরে থাকি।”

ডাকাতরা আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল।

ওদিকে নীচের তলায় গজাননের জানলার বাইরে ছ’জন হনুমান জড়ো হয়েছে। তারা বিচিত্র সব শব্দে কথা বলছিল।

গজানন জানলার কাছে বসে নিবিষ্ট হয়ে তাদের কথা শুনছিল। তারপর সেও কয়েকটা বিচিত্র শব্দ করল। হনুমানেরা ধীরে ধীরে চুলে গেল।

মাঝরাতে শাসন একটা শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। রাতের কিছু চেনা শব্দ আছে। কুকুর বা শেয়ালের ডাক, বাদুড়-প্যাঁচার শব্দ, ইঁদুরের শব্দ, আরশোলার ফরফর, জীবজন্তুদের দৌড়োদৌড়ি, গাছে বাতাসের শব্দ, দূরের পেটা ঘড়ির আওয়াজ। কিন্তু এটা সেইসব চেনা শব্দ নয়। এত সূক্ষ্ম একটা খসখসে আওয়াজ যে, শুনতে পাওয়ার কথাই নয়!

শাসন উঠে বসে শব্দটা ফের শোনার চেষ্টা করছিল। ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ। গায়ে হঠাৎ কেন যেন কাঁটা দিচ্ছিল তার। সেদিন কে যেন তার মাথা লক্ষ্য করে একটা কামানের গোলা ছুঁড়ে মেরেছিল। সে-ই আবার এল না তো কাজটা সমাধা করতে? সে গরিব মানুষ। নিতান্তই দীনদরিদ্র একটা টালির চাল আর বাঁশের বেড়ার ঘরে থাকে। দরজা জানলা মোটেই মজবুত নয়। একটা লাথি মারলেই ভেঙে পড়বে। এ ঘরে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

শাসন তার চৌকি থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, বাইরে কোনও সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না। কিছু শুনতে না পেয়ে সে দরজার তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখার চেষ্টা করল। ভাগ্য ভাল, বাইরে একটু জ্যোৎস্নার আলো আছে। সামান্য ফাঁক দিয়ে সে বারান্দা আর উঠোনের একচিলতে অংশ আবছা দেখতে পাচ্ছিল। সেখানে কেউ নেই। তবু সে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে এসে তার উঠোনে দাঁড়াল। বিশাল চেহারা, গায়ে কালো পোশাক, মুখে মুখোশ। একটা ক্ষীণ শিসের শব্দ হল। আরও কয়েকজন উঠোনে এসে ঢুকল।

প্রত্যেকেরই চেহারা খুব শক্তপোক্ত। প্রত্যেকের মুখেই মুখোশ।

শাসনের পালানোর কোনও রাস্তা নেই। এরা যে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি তাও সে বুঝতে পারছে। কিন্তু আত্মরক্ষার কোনও উপায় আপাতত সে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিনা দীর্ঘকাল বিপদ-আপদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে সে চট করে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে না। কৌশল ছাড়া এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা যে শক্ত, তা বুঝতে হঠাৎ সে এক দুঃসাহসী কাজ করে ফেলল।

হুড়কো খুলে দরজার কপাট সরিয়ে সে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, “মহারাজের জয় হউক।

এই দীনের কুটিরে পদার্পণ করিয়াছেন। আমি ধন্য।”

বলেই শাসন একটা আভূমি অভিবাদন করে ফেলল।

তার এরকম আচরণে লোকগুলো একটু থমকে গেছে।

সামনের বিশাল পুরুষটি বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, “তুই কে?”

“শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পূজার্চনাদি করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকি।”

“আমি কে, তা তুই জানিস?”

শাসন জানে না। কিন্তু তার মন বলছিল, এই লোকটা বিষাণ দত্তের সেই মেঘনাদবাবু হলেও হতে পারে। নিতান্তই অনুমান। তবে বিদ্যুৎ-চমকের মতো হঠাৎ তার মাথায় একটা নাম খেলে গেল।

সে হাঁটু গেড়ে বসে অতি বিনীতভাবে বলল, "ধর্মনগরের অধিপতি মহারাজ মঙ্গলকে আমার আনুগত্য জানাইতেছি।"

লোকটা হঠাৎ এগিয়ে এসে বজ্রমুষ্টিতে তার চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কে বলেছে যে, আমি রাজা মঙ্গল?"

প্রবল সেই ঝাঁকুনিতে শাসনের মনে হল তার মুণ্ডুটা বোধ হয় ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

শাসন ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "ক্ষমা করুন মহারাজ, আমার ভ্রম হইয়াছে।"

লোকটা অবশ্য তাকে ছাড়ল না। আর-একটা ঝাঁকুনিতে তার ঘাড়ের হাড় প্রায় আলগা করে দিয়ে বলল, "সব ব্যাপারে নাক গলাতে তোকে কে বলেছে?"

ব্যথায় শাসনের চোখে জল এল। সে বলল, "আর এইরূপ হইবে মহাশয়, বাক্য প্রদান করিতেছি।"

লোকটা তাকে হাতের ঝটকায় দাওয়ার ওপর ফেলে দিল। তারপর একজন সঙ্গীকে বলল, "আমার খঙ্গটি দাও।"

লোকটা একটা ঝকমকে খাঁড়া এগিয়ে দিল। লোকটা খাঁড়ার ধারটা একটু পরীক্ষা করে নিয়ে এগিয়ে এল।

শাসনের একটি গুণ আছে। সে হরিণের মতো দৌড়তে পারে। সে পড়ে গিয়েই ভেবে নিয়েছিল, যদি সে উঠে ছুট লাগায় তবে এইসব ভারী চেহারার লোকেরা তার নাগাল

পাবে না। কিন্তু উঠে দৌড় লাগানোর জন্যও একটু সময় দরকার। সেই সময়টুকু পাওয়া যাবে কি?

লোকটা খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে একজনকে বলল, "ওর মাথাটা ধরো।"

একটা লোক এগিয়ে এল। একটু সুযোগ। ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা আর মাথার ভেতরে একটা ডোম্বল ভাব সত্ত্বেও নিতান্ত জৈব প্রাণরক্ষার তাগিদে সে প্রায় অন্ধের মতো হঠাৎ শরীরটা গড়িয়ে এক ঝটকায় উঠোনে পড়ে গেল। পড়েই সে এগিয়ে-আসা লোকটার একটা ঠ্যাং ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই লোকটাও বিশাল একটা গাছের মতো দড়াম করে পড়ল উঠোনে। একটা 'রে রে' শব্দ করে উঠল সবাই। শাসন একটা লাফ দিয়ে খানিকটা তফাতে গিয়েই উঠোনের বেড়াটা ডিঙিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটতে লাগল। টের পেল পেছনে পেছনে লোকগুলো ভারী পা ফেলে দ্রুত ছুটে আসছে।

দিগ্বিদিক খেয়াল না করেই শাসন ছুটতে ছুটতে ডানধারে অন্ধকার আমবাগানটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমবাগানে চট করে লুকিয়ে পড়া যায়। সহজে ধরতে পারবে না।

সে অন্ধকার বাগানটায় ঢুকতেই কয়েকটি হনুমান হুপ-হুঁপ করে যেন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এ-সময়ে ওদের চেঁচামেচি করার কথা নয়। শাসন তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে আড়ালে খানিক দৌড়ে, খানিক হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল। যতখানি সম্ভব ওদের কাছ থেকে দূরে যাওয়া দরকার। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি।

পেছন থেকে মাঝে-মাঝে জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ছে এদিক-সেদিকে। ওরা টের পেয়েছে যে, সে আমবাগানে ঢুকেছে। এবার ওরা চারধারে ছড়িয়ে পড়ে তাকে খুঁজবে। খুব সহজে রেহাই পাবে না শাসন। প্রাণভয়ে সে ফের ছোটার চেষ্টা করল। দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু দমে গেল না। এগোতে লাগল।

হঠাৎ 'বাপ রে' বলে একটা চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে। আর-একজন চেঁচিয়ে বলল, "গাছ থেকে কে যেন ঢিল মারছে হুজুর।"

গম্ভীর গলাটা বলল, “গাছে তাক করে গুলি চালাও।” দুম করে একটা গুলির শব্দ হল। সেইসঙ্গে হনুমানদের হুপ-হুঁপ শব্দ আসতে লাগল।

এই সুযোগে অনেকটাই এগিয়ে গেল শাসন। কে ঢিল মারল তা বুঝতে পারছে না। হনুমানগুলোই কি? এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

হাঁটতে হাঁটতে আর দৌড়তে দৌড়তে সে যখন আমবাগানটা পেরিয়ে খোলা জায়গায় পা ফেলল, তখন ভোর হয়ে আসছে। এবং সে ধর্মনগর শিবাইতলার গঞ্জে পৌঁছে গেছে। সামনেই গন্ধর্বদের বাড়ি।

৭. পুলিশ এসেছে

শেষ রাতে পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয়েছে, পুলিশ এসেছে। বাড়ি গিজগিজ করছে লোকে। মন্মথ ডাক্তার এসে হরিকৃষ্ণের ক্ষতস্থান ধুইয়ে ওষুধ লাগিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। সকলেই আতঙ্কিত।

এই গণ্ডগোলে পুতুল আর অবু চুপিসারে নীচে নেমে এসে গজাননের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পুতুলের হাতে একটা ডল পুতুল।

"গজাননদাদা!"

"কী বাবা?"

"তুমি জেগে আছ?"

"হ্যাঁ বাবা, আমার ঘুম আসছে না।"

"তুমি তো জানো না গজাননদাদা, আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল।"

গজানন ধীরে ধীরে আরামকেদারায় উঠে বসল। বলল, "জানি বাবা। আমার দুতেরা আমাকে খবর দিয়ে গেছে।"

পুতুল কান্না চাপতে-চাপতে বলল, "কর্তাবাবাকে, দাদুকে, আমার বাবা আর জ্যাঠাকে খুব মেরেছে। কর্তাবাবাকে ছুরি মেরেছে, গলাও কাটতে যাচ্ছিল।"

গজানন মাথা নেড়ে বলল, "হায় হায়! তোমাদের বড় বিপদ হল তো!"

"হ্যাঁ গজাননদাদা। আমার খুব কান্না পাচ্ছে। ওরা ভীষণ খারাপ লোক।"

অবু বলল, “গজাননদাদা, ওরা কেন এসেছিল জানো? তোমার সেই কৌটোটা কেড়ে নিয়ে যেতে।”

গজানই মাথা নেড়ে বলল, “হায় হায়। সেটা গেলে আমার আর কিছু করার থাকবে না! আমি যে বড় দুর্বল হয়ে যাব।”

“কৌটোটা ওরা নিয়ে গেছে গজাননদাদা।” গজানন ফের ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। বলল, “তা হলে আমার আর কিছু করার নেই। কিছু করার নেই।”

অবু বলল, “কেন গজাননদাদা, তোমার কী হবে?”

গজানন মৃদুস্বরে বলে, “জানি না বাবা। আমার কৌটোটার জন্য তোমাদের কত বিপদ গেল। তোমরা কত কষ্ট পেলে।”

পুতুল এক-পা এক-পা করে কাছে গিয়ে গজাননের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “শোনো গজাননদাদা, আমরা কিন্তু বোকা নই। আমরা আন্দাজ করেছিলাম তোমার কৌটোটা আমাদের স্টোর রুমের সিন্দুকেই আছে। কারণ পুরনো জিনিসপত্র সব ওখানেই থাকে। তাই আমি আর মেজদা মিলে বুদ্ধি করে গভীর রাতে উঠে কর্তাবাবার তোশকের তলা থেকে চাবি নিয়ে গিয়ে সিন্দুক খুলি। তোমার কৌটোটা একটা পুরনো পুঁথির সঙ্গে লাল শালুতে জড়ানো ছিল। কৌটোটা আমি এনে আমার পুতুলের বাক্সে লুকিয়ে রেখে দিই। ভেবেছিলাম সকালে তোমাকে এনে দেব। কিন্তু মাঝরাত্রে ডাকাত পড়ল। আমরা ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম ডাকাতরা সবাইকে কীরকম নিষ্ঠুরভাবে মারছে। কৌটোটার জন্য ওরা আমাদের সবাইকে কেটে ফেলবে বলেও ঠিক করেছিল। তখন আমি গিয়ে কৌটোটা বের করে ওদের দিয়ে দিই।”

“ভালই করেছ বাবা। প্রাণের চেয়ে তো আর কৌটোটা বড় নয়!”

“না গজাননদাদা, আমি অত বোকা নই। আমি তার আগে কৌটোটা খুলে ফেলি। দেখি তার মধ্যে তোমার কালো নস্যির গুঁড়ো রয়েছে। আমার একটা ফাঁপা পুতুল আছে, যার মুণ্ডুটা ঘোরালে খুলে যায়। ভেতরটা কোটোর মতো। আমি পুতুলের ভেতরে গুঁড়োটা ঢেলে নিই। তারপর ঠাকুমার কালো মাজনের খানিকটা কৌটোয় ভরে মাণ্ডুককে দিয়ে দিই। সে একটুও বুঝতে পারেনি।”

গজানন উজ্জ্বল হয়ে বলল, “তোমার আশ্চর্য বুদ্ধি বাবা!”

ডল পুতুলটা বাড়িয়ে দিয়ে পুতুল বলল, “এই নাও তোমার নস্যি।”

পুতুলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল গজানন। তার মুখে এক আশ্চর্য আলো ফুটে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল, তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

“তুমি কাঁদছ কেন গজাননদাদা?”

“একটা দুষ্ট লোকের জন্য কাঁদছি। সে কিছুতেই ভাল হতে চায় না। তাকে আমি মারতে চাইনি কখনও। কিন্তু কী যে করি!”

“কেঁদো না গজাননদাদা। তোমার নস্যি তো পেয়ে গেছ। আমাদের কাছে থাকো। আমরা তোমাকে খুব ভালবাসব।”

“জানি বাবা, জানি। তোমরা বড় ভাল। কিন্তু দুষ্টু লোকটা কি তোমাদের শান্তিতে রাখবে? খুঁজতে খুঁজতে সে এল বলে!”

“সে কি আবার আসবে?”

“হয়তো আসবে। কে জানে কী হবে!”

“এই দুষ্ট লোকটার নাম মাণ্ডুক। তুমি ওকে চেনো?” মাথা নেড়ে গজানন বলে, “না বাবা, চিনি না। কিন্তু সে ভাল লোক নয়। তার বুকে মায়াদয়া নেই, শুধু জ্বালা আছে।”

পুতুল কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, “সে যদি আবার এসে আমাদের মারে?”

“না বাবা, সে তোমাদের মারবে না। সে এবার আর একজনকে মারবে। তোমরা গিয়ে ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমোও।”

.

শাসন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে যখন পৌঁছল তখন রায়বাড়ির ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। দু-একজন ছাড়া কেউ নেই। সদর দরজা ভাঙা দেখে বিস্মিত শাসন ওপরে উঠে চারদিকে অবস্থা দেখে বুঝল কী হয়েছে।

গন্ধর্ব বলল, “শাসনবাবু যে!”

“মহাশয়, এসব কী?”

“কাল রাতে সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে।”

“মহাশয়, বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করুন।”

গন্ধর্ব ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করে বলল, “গজাননের কৌটোটা আমার মেয়ে যদি বের করে না দিত তা হলে আমাদের সবাইকে কেটে ফেলত লোকটা।”

“মহাশয়, ঘটনাটা সাধারণ নহে। একটি প্রাচীন কৌটার জন্য এত হিংস্রতা অস্বাভাবিক। কিছু বুঝিতেছেন?”

মাথা নেড়ে গন্ধর্ব বলে, “না। কৌটোটার মধ্যে কী ছিল তাও জানি না। লোকটা একবার কৌটোটা খুলেছিল। দুর থেকে মনে হল কালোমতো কী যেন। হিরে-জহরত নয়। কিন্তু আপনাকেই বা এমন ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন?”

শাসন তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলল, “মহাশয়, বিপদ এখনও কাটে নাই।”

"কেন ওকথা বলছেন?"

"আমার মনে হইতেছে বাতাসে একটা দ্বৈরথের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলিতেছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে আর বিলম্ব নাই।"

"কীসের দ্বৈরথ! কার সঙ্গে কার?"

"এক প্রাচীন কিংবদন্তির সহিত এক জিঘাংসার।"

"এ তো হেঁয়ালি!"

"না মহাশয়, হেঁয়ালি নহে।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"বলিলেও আপনার বিশ্বাস হইবে না। আপনার কন্যাটিকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। দুই-একটা প্রশ্ন করিব।"

গন্ধর্ব পুতুলকে ডাকিয়ে আনল। একটু ভয়ে-ভয়ে সে এসে দাঁড়াল।

শাসন তার দিকে চেয়ে হেসে বলল, "তুমি গত রাত্রে সকলের প্রাণরক্ষা করিয়াছ। মা, কৌটাটি তুমি কোথায় পাইলে?"

"সিন্দুকে ছিল।"

"কৌটাটি কাহার, তাহা জানো?"

"জাদুকর গজাননের!"

"কীরূপে জানিলে?"

“শুনেছি।”

“জাদুকর গজানন কে, তা জানো মা?”

“সে একজন ভাল লোক।”

“ভাল লোক! মা, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ?”

“না তো!”

“তবে কীরূপে জানিলে যে, সে ভাল লোক?”

পুতুল গম্ভীর হয়ে বলল, “আমার মনে হয়।”

“মা, গজানন নামে এক ব্যক্তি এই স্থানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সম্ভবত আসল জাদুকর গজানন নহে। সম্ভবত ছদ্মবেশী কোনও অসাধু লোক।”

পুতুল মাথা নেড়ে বলল, “আমি তাকে চিনি না। আমাদের গজানন ভাল লোক।”

শাসন বিস্মিত হয়ে বলে, “তোমাদের গজানন?”

পুতুল জিভ কেটে চুপ করে গেল।

“তোমাদের গজানন কীরূপ? শ্মশ্রুগুম্ফ আছে কি?”

পুতুল ফিক করে হেসে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

শাসন কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল।

গন্ধর্ব বলল, “কী বুঝলেন?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাসন বলল, "মহাশয়, যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন।"

"বলুন, শুনছি।"

"আমার অনুমান, পুতুল গজাননের সন্ধান জানে। সম্ভবত এই বাড়ির শিশু, বালক-বালিকারা সকলেই জানে। কিন্তু তাহারা কিছুতেই গজাননের সন্ধান আমাদিগকে দিবেনা। মহাশয়, আপনারা দয়া করিয়া প্রাপ্তবয়স্কেরা উহাদের উপর চাপ দিয়া কোনও কথা আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন না। শুধু চতুর্দিকে নজর রাখিবেন। "

গন্ধর্ব বলল, "গজাননকে ওরা কোথায় পেল? আমরা তো তার দেখা পাচ্ছি না।"

"এমনও হওয়া বিচিত্র নহে, এই বাড়ির কোনও চোর কুঠুরিতেই সে এখন অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মহাশয়, তাহাকে না উত্তেজিত করাই মঙ্গল। শিশুরাই তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করুক।"

"বলছেন কী মশাই! যদি সে কোনও জোচ্চোর হয়?"

মাথা নেড়ে শাসন বলল, "না মহাশয়, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কহিতেছে আপনার শিশুকন্যা ভুল করে নাই।"

"আপনি কি বলতে চান এই গজাননই সেই গজানন? লোকটা দুশো বছর বেঁচে আছে?"

"মহাশয়, যাহা ঘটে তাহা বিশ্বাস না করিবেন কেন?"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"তাহা হইলেও কোনও অবিমৃশ্যকারিতা করিবেন না। মনে রাখিবেন মাণ্ডুক এক ভয়ানক ব্যক্তি। তাহার হাত হইতে আমাদের নিস্তার নাই। কারণ, সে গজাননকে না-পাওয়া পর্যন্ত

শান্ত হইবেনা। সম্ভবত মাগুকই মেঘনাদবাবু। যদি তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে চান তাহা হইলে গজাননই একমাত্র ভরসা। কথাটা মনে রাখিবেন।”

“আপনি তো চিন্তায় ফেলে দিলেন মশাই!”

“চিন্তা ও উদ্বেগেরই বিষয়।”

“শাসনবাবু!”

“আজ্ঞা করুন।”

“আমি বলি, আপনার এখন নিজের বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ নয়। কাল আপনার বাড়িতে হামলা হয়েছে। আপনি বরং দু-একদিন আমাদের বাড়িতে থাকুন। আমাদের ঘরের অভাব নেই।”

শাসন একটু হাসল, “প্রস্তাবটি উত্তম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অতিথি হইতে বিশেষ আপত্তি নাই। প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলাম।”

শাসনকে নীচের তলার বৈঠকখানায় থাকতে দেওয়া হল। দুপুরে খাওয়ার পর সে বাগানটা দেখতে বেরোল। সঙ্গে গন্ধর্ব।

পেছনের পাঁচিলের কাছে এসে গন্ধর্ব বলল, “পাঁচিলের ওই জায়গায় নাকি গজানন উঠে বসে ছিল। আমার বাবা দেখেছে।”

“এই সু-উচ্চ প্রাচীর, তাহাতে আবার লৌহশলাকা ও কাঁচ প্রোথিত। ইহার উপর কোনও স্বাভাবিক মনুষ্যের উপবেশন অসম্ভব। মহাশয়, লেভিটেশন বলিয়া একটা কথা আছে।”

“জানি। ওসব গাঁজাখুরি।”

"প্রাচীনকালে সাধকরা বায়ুবন্ধন করিয়া শূন্যে কিছুদূর উত্থিত হইতে পারিতেন বলিয়া শুনা যায়। কত বিদ্যাই চর্চার অভাবে বিনষ্ট হইয়াছে।"

"ওসব বিশ্বাসযোগ্য নয়।" শাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আজিকালি কেহই কোনও কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না।"

খুব ভোর রাত্রে শাসন চুপিচুপি উঠল। সদর দরজা নিঃশব্দে খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ধীর পায়ে বাড়িটি পরিক্রমা করতে লাগল। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। সে প্রত্যেকটা জানলা লক্ষ করতে করতে এগোচ্ছিল। যদি কোনও আভাস পাওয়া যায়!

আচমকা একটা খোলা জানলার পাশে থমকে দাঁড়ায় সে। নীচের তলায় কেউ থাকে না বলে সব জানলাই বন্ধ, শুধু একটাই ভোলা। কাছে গিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে উঁকি দিল শাসন। প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে যাওয়ার পর সে লক্ষ করল ঘরের ভেতরে একটা আরামকেদারা। তার ওপর সামান্য উচ্চতায় শুন্যে ভেসে একজন শুয়ে আছে।

চমকৃত শাসন কিছুক্ষণ নড়তে পারল না। তারপর হঠাৎ তার দু'চোখ ভরে জল এল। সে বিড়বিড় করে বলল, "আমার প্রণাম গ্রহণ করুন হে জাদুকর। আমরা সামান্য মনুষ্য, আপনার মর্ম কী বুঝিব?"

হঠাৎ কয়েকটা হনুমান হুপ-হুঁপ করে গাছে-গাছে লাফঝাঁপ করতে লাগল। চমকে উঠে শাসন যেই পেছন ফিরতে যাবে অমনি একটা ভারী শক্তিমান হাত তার ডান কাঁধের ওপর এসে পড়ল।

একটা চাপা হিংস্র গলা বলল, "এবার কে তোকে বাঁচাবে?"

শাসন ফিরেই রাক্ষসের মুখটা দেখতে পেল।

শাসনের কেন যেন একটুও ভয় হল না। সে পিছু ফিরে লোকটার মুখোমুখি হয়ে চোখের জল হাত দিয়ে মুছে একটু হেসে বলল, “আপনি মেঘনাদবাবু, মাণ্ডুক?”

লোকটা মুখোশের আড়াল থেকে তাকে দেখছিল। বলল, “তাতে তোর কী দরকার?”

“মহাশয়, যেই হউন, আপনি মন্দ লোক। মন্দ লোকেরা তাহাদের কার্যের জন্য শাস্তি ভোগ করিবেই। আপনারও রক্ষা নাই মহাশয়। সময় থাকিতে এখনও সতর্ক হউন, জিঘাংসা পরিহার করুন।”

হনুমানগুলো প্রচণ্ড শব্দ করতে লাগল। কয়েকটা ঢিল এসে পড়ল তাদের আশপাশে।

বিশালদেহী লোকটা হয়তো শাসনকে ছিঁড়ে ফেলত, কিন্তু হঠাৎ জানলার দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে গেল। শাসন ফিরে তাকিয়ে দেখল, জানলায় জাদুকর গজানন এসে দাঁড়িয়েছে। মুখটায় যেন আলো জ্বলছে। বিড়বিড় করে গজানন বলছে, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই আকৃতি! রাজা মঙ্গলের মতো। হুবহু। কিন্তু তা কী করে হবে? কী করে হবে?

লোকটা একটা বিশাল রণহুঙ্কার দিয়ে উঠল। তারপর বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, “জাদুকর গজানন!”

ভভারের আলো ফুটিফুটি করছে। কাক ডাকছে। পাখিরা উড়াল দেওয়ার মুখে। হনুমানদের তীব্র চিৎকারে চারদিক মথিত হতে লাগল।

মাণ্ডুক বা মেঘনাদ ফের রণহুঙ্কার দিয়ে বলল, “জাদুকর গজানন, এইবার ঋণ শোধ করো। বহুঁকাল ধরে অপেক্ষায় আছি।”

দুটো প্রবল হাতের টানে জানলাটা ফ্রেম থেকে উপড়ে এনে ফেলে দিল মাণ্ডুক। কোষবদ্ধ তলোয়ার বের করে ফের বজ্রনির্ঘোষে বলল, “এসো কাপুরুষ!”

বাড়ির লোকেরা জেগে দ্রুত নেমে আসছে। ঘুম ভেঙে লোকজন ছুটে আসছে চারদিক থেকে। কাল রায়বাড়িতে ডাকাত পড়ায় তারা সতর্কই ছিল।

জানলা দিয়ে ধীরে বেরিয়ে এল গজানন। ভেসে-ভেসে এল। এসে দাঁড়াল মাণ্ডুকের সামনে। ডান হাতটা তুলে সে বিড়বিড় করে বলল, "না, তুমি মঙ্গল নও।"

"আমি তার বংশধর। রাজা মঙ্গলের ঋণ শোধ নেওয়ার জন্যই আমি জন্মেছি। আমি মাণ্ডুক।"

হতাশায় ভরা মুখে গজানন বলল, "দুই-ই এক। আমার আর ইহজীবনে শান্তি হল না।"

মাণ্ডুক তার তলোয়ারটা তুলে আড়াআড়ি বিদ্যুতের গতিতে চালিয়ে দিল গজাননের গলায়।

গজানন শুধু মাথা নাড়ল। তার গলার ভেতর দিয়ে তলোয়ার চলে গেল বটে, কিন্তু কিছুই হল না।

বিস্মিত মাণ্ডুক ক্ষণেক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে বিদ্যুৎ গতিতে গজাননকে খণ্ড খণ্ড করে দিতে তরোয়াল চালাতে লাগল।

কিন্তু কিছুই হল না।

এবার তলোয়ার ফেলে মাণ্ডুক লাফিয়ে পড়ল গজাননের ওপর। গলা টিপে ধরল। গজানন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু। বিস্মিত মাণ্ডুক তার চোখ উপড়ে নেওয়ার জন্য চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। মুগুরের মতো দুই হাতে অজস্র ঘুসি মারল।

চারদিকের লোক প্রথমে ভয়ে চিৎকার করছিল। কিন্তু তারাও বিস্ময়ে চুপ হয়ে গেছে।

মাণ্ডুক হাঁফাচ্ছে। তার চোখ বড় বড়। রাগে তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে।

"মরো গজানন, মরো।"

গজানন শান্ত কণ্ঠে বলে, "আমার কি মরণ আছে?"

"তোমাকে মরতেই হবে!"

মাগুক কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে গজাননকে পরপর দু'বার গুলি করল। কিছুই হল না। গজাননকে ছুঁয়ে গুলিগুলো গিয়ে পেছনের দেয়ালে বিধল।

হঠাৎ গজাননের চোখে একটা নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল যেন! একটু দুলে সে শূন্যে ভেসে রইল একটুক্ষণ। তারপর সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঋজু হয়ে একটা বল্লমের মতো তীব্রগতিতে গিয়ে পড়ল মাকের ওপর।

মাত্র একবারই। মাগুক মাটিতে পড়ে একটু ছটফট করে নিথর হয়ে গেল।

গজানন সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর চারদিকে চেয়ে বিস্মিত মুখ আর বিস্ফারিত চোখগুলি দেখল সে। সবাই হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

গজানন মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, "এর শেষ নেই। এর কোনও শেষ নেই। বারবার শেষ হয়, আবার হয়ও না।"

সে চারদিকে ফের চেয়ে দেখল। তারপর বলল, "চলি বাবারা।"

হঠাৎ পুতুল ছুটে এসে তার হাত ধরল, "কোথায় যাচ্ছ গজাননদাদা? আমার কাছে থাকবে না?"

"না খুকি, আমাকে ঘরে রাখতে নেই।"

"তুমি কোথায় যাবে গজাননদাদা?"

একটু ম্লান হেসে গজানন বলল, “কোথাও কোনও পাহাড়ের গুহায় গিয়ে শুয়ে থাকব, হয়তো কয়েকশো বছর। কে জানে! আবার হয়তো ডাক আসবে। না বাবা, আমি জানি না। আমি জানি না।”

গজানন ধীরে ধীরে হেঁটে, একটু ভেসে-ভেসে চলে যেতে লাগল। ফটক ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে ঢেউয়ের মতো চলে যাচ্ছিল সে। অনেক দূর থেকে একবার হাত তুলল। তারপর হাওয়ায় ভেসে-ভেসে কাটা ঘুড়ির মতো টাল খেতে-খেতে ক্রমশ বিন্দুর মতো ছোট হয়ে গেল। তারপর মুছে গেল যেন। কোনও চিহ্নই আর রইল না তার।

গন্ধর্ব বিড়বিড় করে বলল, “মহাশয়, আপনাকে প্রণাম করি।”